মাসিক

আলোকধারা

রেজিঃ নং-২৭২
১৮শ বর্ষ
অষ্টম সংখ্যা
আগষ্ট ২০১৩ ঈসায়ী

তাসাউফ বিষয়ে বহুমূখী গবেষণা ও বিশ্লেষণমূলক জার্নাল

ঈদ মুবারক

জেরুযালেমে

হযরত মূসা আলাইহিস্‌সালাম-এর মাজার শরীফ

তৌরাত শরীফ

হযরত মূসা আলাইহিস্‌সালাম-এর লাঠি মোবারক

হযরত মূসা আলাইহিস্‌সালাম-এর স্মরণে বার্ষিক উৎসবে বাদ্যযন্ত্রসহ উপস্থিতি

মাসিক
আলোকধারা
THE ALOKDHARA
A MONTHLY JOURNAL OF
TASAWWUF STUDIES

রেজি: নং ২৭২, ১৮শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা

আগস্ট ২০১৩ ঈসায়ী
রমজান-শাওয়াল ১৪৩৪ হিজরী
শ্রাবণ-ভাদ্র ১৪২০ বাংলা

প্রকাশক
সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান

সম্পাদক
মো: মাহবুব উল আলম

যোগাযোগ:
লেখা সংক্রান্ত: ০১৮১৮ ৭৪৯০৭৬
০১৭১৬ ৩৮৫০৫২
মুদ্রণ ও প্রচার সংক্রান্ত: ০১৮১৯ ৩৮০৮৫০
০১৭১১ ৩৩৫৬৯১

মূল্য : ১৫ টাকা
(US $=2)

সম্পাদকীয় যোগাযোগ:
দি আলোকধারা প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিশার্স
৫ সিডিএ, সি/এ (তেতলা) মোমিন রোড,
চট্টগ্রাম। ফোন : ৬১৮৮৫৫

শাহানশাহ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক
মাইজভাণ্ডারী (কঃ) ট্রাস্ট-এর একটি প্রকাশনা

Web:www.sufimaizbhandari.org
E-mail:sufialokdhara@gmail.com

সূচী

■ সম্পাদকীয়: মাইজভাণ্ডার শরীফে ঈদুল ফিতর ভিত্তিক বিকাশমান সংস্কৃতি--২
■ প্রচ্ছদ প্রতিবেদনঃ হযরত মূসা আলাইহিস্‌সালাম
– মুহাম্মদ ওহীদুল আলম ---------- ৩
■ আত্‌তাওজিহাতুল্ বহিয়্যাহ্ বা সিজ্‌দাহ্ তাহিয়্যার সুপ্রমাণ পুঞ্জ
– অনুবাদ: এস এম জাফর ছাদেক আল্ আহাদী ---------- ৫
■ আঈনায়ে বারী ফি তরজুমাতি গাউসিল্লাহিল আ'যম মাইজভাণ্ডারী বা 'গাউসুল্লাহিল আ'যম মাইজভাণ্ডারীর 'জীবন চরিত' এ প্রভুর দর্পণ'
– অনুবাদ: বোরহান উদ্দীন মুহাম্মদ শফিউল বশর ---------- ৮
■ সূফী তত্ত্ব ও সূফী সাধনায় ফানা ও বাকা
–মোহাম্মদ জাফর উল্লাহ ---------- ১৩
■ আধ্যাত্মিক পথ ও পাথেয়
– অধ্যক্ষ আলহাজ্ব মাওলানা গোলাম মুহাম্মদ খান সিরাজী -- ১৬
■ ঈদুল ফিতরের ধর্মীয় ও ব্যবহারিক তাৎপর্য
– ড. মুহম্মদ আবদুল মান্নান চৌধুরী ---------- ২০
■ হযরত জাফর আত-তাইয়ার (রাদ্বিঃ) - উদ্বাস্তু হয়ে আফ্রিকায় বয়ে নিয়ে গেছেন ইসলামের পতাকা
– অনুবাদ ঃ মুহাম্মদ ওহীদুল আলম ---------- ২৩
■ ঈমান ও আখলাক ঃ পর্ব -০১
– সৈয়দ মুহাম্মদ ফখরুল আবেদীন রায়হান ---------- ২৫
■ মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফ সকল সম্প্রদায়ের জন্য রহমতস্বরূপ
– মুহাম্মদ আহাদুজ্জামান ---------- ২৮
■ গার্মেন্টের ভাবমূর্তি ও আমাদের করণীয়
– অধ্যাপক এ ওয়াই এম জাফর ---------- ২৯
■ স্মৃতিতে শাহানশাহ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ)
– আ ব ম খোরশিদ আলম খান ---------- ৩২
■ আল্-কুরআনে বর্ণিত দু'আসমূহ : একটি পর্যালোচনা
– ড. মোহাম্মদ ইলিয়াছ ছিদ্দিকী ---------- ৩৭
■ ঈমাম নাসায়ী আলাইহির রহমাহু
– কাজী মুহাম্মদ ইব্রাহীম ---------- ৪২
■ লাইলাতুল কদরের তাৎপর্য ও আমল
– মুহাম্মদ রবিউল আলম ---------- ৪৪
■ তাজকিয়া বিতর্ক প্রতিযোগিতা ২০১৩
– অন্ত নূর ---------- ৪৭

সম্পাদকীয়...

মাইজভাণ্ডার শরীফে ঈদুল ফিতর ভিত্তিক বিকাশমান সংস্কৃতি

"ও মন রমজানের ঐ রোজার শেষে
এল খুশীর ঈদ।
তুই আপনাকে আজ বিলিয়ে দে
শোন্ আসমানী তাকিদ।। ...
... যারা জীবন ভরে রাখছে রোজা
নিত্-উপবাসী
সেই গরীব এতিম মিসকিনে দে
যা কিছু মকিদ।।
ঢাল্ হৃদয়ের তোর তশ্তরীতে
শিরনী তৌহিদের,
তোর দাওত্ কবুল করবেন হযরত
হয় মনে উজীদ।।"

কবি নজরুলের শাশ্বত এই সঙ্গীতে পবিত্র ঈদুল ফিতরের আনন্দ-আকুলতা-দর্শন ও প্রত্যাশার যে শব্দ-চিত্র ফুটে উঠেছে, তা হৃদয়ঙ্গম করতে পারলে মাহে রমজানের অন্তর্গত রূহানী ও জাহেরী তাৎপর্য সম্যক অনুধাবন করা যে কোন মুমিনের পক্ষে সহজ হয়ে উঠে। ইসলামী জীবন-দর্শনে স্পষ্ট ভাষায় বর্ণিত হয়েছে যে, একই সাথে মানুষের মধ্যে দুটো উপাদান বিদ্যমানঃ একটি দেহ, আরেকটি আত্মা। এই উভয় উপাদানের সর্বাঙ্গীন বিকাশ সাধনই ইসলামের ব্যবহারিক দাবী। পার্থিব জীবনের প্রয়োজনীয়তাকে পরিহার করে কেবল আত্মিক উৎকর্ষ অর্জনে ব্যাপৃত থাকা ফেরেশ্তাদের কাজ বা অপার্থিব বিষয়। আবার এর বিপরীতক্রমে রূহ্ বা আত্মিক দিককে উপেক্ষা করে কেবলমাত্র পার্থিব ক্রিয়া-কর্মের মাঝে ডুবে থাকা আল্লাহ্র সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষের জন্য কাম্য নয়। মানুষের কর্তব্য হলো, একই সাথে রূহের ও শরীরের চাহিদার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে চলা। অন্যথায়, সৃষ্টির এই দুটো উপাদান বা ক্ষমতা দিয়ে মানব সৃষ্টির মৌলিক উদ্দেশ্য অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। সূফিয়ায়ে কেরাম লক্ষ্য করেছেন যে, মানব-মনের মধ্যে পশুস্বভাবও সক্রিয়, যা মানুষের আত্মিক উন্নতির পথে অন্তরায় সৃষ্টি করে। শরীরকে আত্মার নিয়ন্ত্রণে আনতে হলে দৈহিক তাড়নাকে সংযত করতে হয়, আত্মিক শক্তিকে সমৃদ্ধ করতে হয় এবং এ জন্যে ক্ষুধা-তৃষ্ণার কষ্ট ও রিপুর তাড়নাকে পরিহার করতে হয়। একই সাথে জিহ্বা ও মনের চাহিদা এবং অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকেও নিয়ন্ত্রণ করা আবশ্যক। রমজান মাসে সিয়ামের বিধান সমূহ এই লক্ষ্য অর্জনে মানুষকে সফলভাবে সহায়তা করে। ইসলামের জীবন পরিক্রমায় জাগতিক ও আধ্যাত্মিক উভয় বিষয় অন্তর্ভুক্ত। পৃথিবীতে একজন মানুষের আবির্ভাব ও বেঁচে থাকার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য মৃত্যুপরবর্তী অনন্ত জীবন তথা আখেরাতের প্রস্তুতি গ্রহণ। এই প্রস্তুতির জন্য প্রয়োজন তাকওয়া অর্জন। সিয়ামের সাধনা সবিশেষ সৌন্দর্য মন্ডিত মানবিক প্রশিক্ষণ। সারাদিন পানাহার ও জৈবিক চাহিদা থেকে বিরত থাকতে হয় বলে এতে লোক দেখানোর অবকাশ নেই। তাই হাদীসে কুদসীতে বলা হয়েছে, "আস-সওমু লী ওয়া আনা আজজি বিহি - অর্থাৎ রোজা আমার জন্য এবং তাই এর পুরস্কারও আমি নিজে দেবো।" আল্লাহ্ রহমানুর রহীম সর্বদা মানুষকে তাঁর রহমতের পথে আহ্বান করেন। এই রমজানের তিনটা দশমাংশে তাই যথাক্রমে রহমত, মাগফেরাত ও নাজাতের (দয়া, ক্ষমা ও মুক্তি) দরোজা উন্মুক্ত রাখা হয়েছে। এই পবিত্র মাসের মধ্যেই অন্তর্লীন মহিমান্বিত লাইলাতুল ক্বদর বিরাজিত।

মাহে রমজান শেষে ঈদুল ফিতর। ফিতর শব্দটার অর্থ বহু ব্যাপক। সব মিলিয়ে যে তাৎপর্য এই দিনটি ধারণ করে তা আনন্দ, মুক্তি ও পুরস্কারের। এই আনন্দ, মুক্তিও পুরস্কারের উৎসব উদযাপন করতে মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফের আশেক-ভক্তবৃন্দ ঈদের দিনে সমবেত হন এখানে। ঈদের নামাজ আদায় করেন এই মহান দরবারে। ঈদের দিনে পুরো মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফ পরিণত হয় এক বিশাল ঈদগাহে। অপূর্ব এই দৃশ্য। বলা যায়, ঈদকে উপলক্ষ করে মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফে গড়ে উঠেছে এর আলোকিত সম্প্রীতির সংস্কৃতি যা ইসলামের অন্যতম মৌল পার্থিব বৈশিষ্ট্য। এ দিনে ভক্তরা এ দরবারে আসেন, নিজেদের সিয়াম কবুল হবার ফরিয়াদ জানান আল্লাহ্র কাছে। এই দরবারের পবিত্র মাটিতে দাঁড়িয়ে আর্জি পেশ করলে কবি নজরুলের ভাষায় "দাওত্ কবুল করবেন হযরত হয় মনে উজীদ।" মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফের ঈদের সংস্কৃতি আমাদের বাংলাদেশের জাতীয় সংস্কৃতিতে এক আলো ঝলমল সংযোজন বটে।

মাহে রমজানের অন্যতম অনুষঙ্গ ফিতরা ও যাকাত। এই বিধান ধর্মীয় আচারের সামাজিক কল্যাণমূলক বিন্যাস। সমাজে ধন-বৈষম্য নিরসন, গরীব-এতিম-মিসকিনদের আর্থিক উন্নয়নের অবশ্য করণীয় প্রয়াস হিসেবে এর এই বিধিবদ্ধতা। কবির ভাষায় যা কিছু 'মকিদ' - তা গরীব-মিসকিনদের দেবার উৎসব। এই আচার ও বিধিবদ্ধ সামাজিক দায়িত্ব পালনকে মাইজভাণ্ডারী জীবনে রূপায়িত করার উদ্দেশ্যে **শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ) ট্রাস্ট** 'মূলধারা সমাজ কল্যাণ সমিতি'র ব্যানারে দারিদ্র্য বিমোচন প্রকল্প হিসেবে 'যাকাত তহবিল' গঠন করেছেন। এই তহবিল বিভিন্ন ক্ষেত্রে দুঃস্থজনের প্রতি ঈমানী সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে মাহে রমজান ও ঈদুল ফিতরের উৎসবকে আরো ব্যাপক সামাজিক তাৎপর্যবহ করার কাজে নিয়োজিত। ঈদুল ফিতর মাইজভাণ্ডারী জীবনে আরো আনন্দ ও কল্যাণ বয়ে আনুক। ঈদ মোবারক, আস্-সালাম।

হযরত মূসা আলাইহিস্‌সালাম

হযরত মূসা আলাইহিস্‌সালাম একজন মহান মর্যাদাশীল নবী। তৌরাতে তাঁর নাম মোজেজ। পৃথিবীতে মানবজাতির হিদায়াতের জন্য আল্লাহ্ যুগের চাহিদা অনুযায়ী নবী রসূল প্রেরণ করেছেন। প্রত্যেক নবী তাঁর পূর্ববর্তী নবীর সত্যায়ন করেছেন ও ভবিষ্যত একজন সর্বশেষ নবীর সুসংবাদ দিয়েছেন। পবিত্র কুরআনের ভাষ্যমতে হযরত মূসা আলাইহিস্‌সালামকে আল্লাহ্‌তায়ালা মিশরের ফেরাউন ও ঈসরাইলীদের সতর্ক ও পথ প্রদর্শনের জন্য প্রেরণ করেছেন। কুরআনে হযরত মূসা আলাইহিস্‌সালাম-এর নাম সর্বাধিকবার (২৩২ বার) এসেছে। অন্য কোন নবীর নাম এতবার উচ্চারিত হয়নি।

আসমানী হিদায়াতপ্রাপ্ত জাতিগুলোর মধ্যে প্রত্যেকেই নিজ নিজ ধর্মগ্রন্থ ও নবীকে চূড়ান্তভাবে বিশ্বাস করে। কেউ কেউ পূর্ববর্তী নবীদেরকেও সম্মান করে থাকে। কিন্তু মুসলমানদের অনন্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তাঁরা সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে মানার পাশাপাশি পূর্ববর্তী সকল নবীদের ওপর ঈমান রাখে। শুধু তাই নয় পূর্ববর্তী নবীদের আনীত কিতাবের ওপরও তারা গভীর ঈমান রাখে।

বস্তুত পূর্ববর্তী নবীদের ও তাঁদের আনীত কিতাবের ওপর বিশ্বাস স্থাপন তাদের ঈমানের অন্তর্গত। তাই মুসলমানদের বিশ্বাস কথা আচরণ বক্তব্য বিবৃতি লেখা-জোখায় কোন নবীর প্রতি সামান্যতম কটূক্তি কিংবা ইনকার প্রকাশ পেতে পারে না।

তাই তারা সবসময় সকল নবীদের প্রতি নিজেদের ঈমানের ঘোষণা দিয়ে যায়। হযরত মূসা আলাইহিস্‌সালাম হযরত হারুন আলাইহিস্‌সালাম হযরত ঈসা আলাইহিস্‌সালাম সহ সকল নবীর প্রতি তাঁদের সমান ভালবাসা, সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রকাশ পায়।

পবিত্র কুরআনের ঘোষণা অনুযায়ীঃ

'স্মরণ কর, এ কিতাবে উল্লিখিত মূসার কথা, সে ছিল বিশুদ্ধচিত্ত এবং সে ছিল রাসূল, নবী।'

তাকে আমি আহ্বান করেছিলাম তুর পর্বতের দক্ষিণ দিক হতে এবং আমি অন্তরঙ্গ আলাপে তাকে নিকটবর্তী করেছিলাম। আমি নিজ অনুগ্রহে তাকে দিলাম তার ভাই হারুনকে নবীরূপে। (সূরা মারইয়াম ১৯ ঃ ৫১-৫৩)

হযরত মূসা আলাইহিস্‌সালাম কে নবী করিম হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুসংবাদ দাতা পূর্বসূরী নবী বিবেচনা করা হয়। রাসূলে করিমের জীবনের সাথে তাঁর জীবনের অনেকাংশে মিল রয়েছে। আধ্যাত্মিকতার দিক থেকে উভয় নবীর জীবনের ঘটনা সমান্তরাল। মিশর হতে ঈসরাঈলীদের বহিঃগমণ হযরত রাসূলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মদীনায় হিজরতের সাথে তুলনীয়। হযরত মূসা আলাইহিস্‌সালাম সর্বশেষ নবীর আগমণ বার্তা আগেই ঘোষণা করেছিলেন।

আসমানী গ্রন্থ হিসেবে 'তৌরাত' আল্লাহ্‌র মহান বাণী। তৌরাতের অনেক বর্ণনা কুরআন কর্তৃক সত্যায়িত। মুসলমানগণ বিশ্বাস করে মিরাজের রজনীতে অন্যান্য অনেক নবীর মত হযরত মূসা আলাইহিস্‌সালাম-এর সাথেও নবী করিম হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সশরীরে সাক্ষাৎ হয়েছিল। মিরাজের রজনীতে হযরত মূসা আলাইহিস্‌সালাম-এর বারংবার অনুরোধে রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্ সুবহানুতা'য়ালার দরবারে সালাতের ওয়াক্তের সখ্যা ৫০ থেকে ৫-এ স্থিত করার আবেদন জানান। ইসলামী সাহিত্যে হযরত মূসা আলাইহিস্‌সালাম-এর জীবনী ও কুরআন হাদীসে বর্ণিত তাঁর মো'জেজা সমূহ গুরুত্ব সহকারে উল্লেখিত আছে।

হযরত ইউসুফ আলাইহিস্‌সালাম এর তিরোধানের পর মিশরের রাজা ফিরাউন ঈসরাঈলীদের দাসত্ব শৃংখলে আবদ্ধ করে রাখেন। দীর্ঘদিন অতিবাহিত হবার পর সমকালীন ফিরাউন এক রাতে স্বপ্নে দেখেন জেরুজালেম থেকে একটি অগ্নিশিখা উত্থিত হয়ে ঈসরাঈলীদের আবাসন ছাড়া মিশরের বাকী সবকিছু জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দিয়েছে। এ স্বপ্নের বিবরণ সভাসদ ও গণকরা অবহিত হলে তাঁরা বলেন অচিরেই ইসরাঈলীদের এক শিশু জন্মগ্রহণ করে ফিরাউনের রাজ্য ধ্বংস করে দেবে। এতে ফিরাউন ভীত হয়ে রাজ্যে এমন এক ফরমান জারী করেন যাতে বলা হয় ইসরাঈলের বংশে জন্মগ্রহণকারী প্রতিটি শিশুপুত্রকে হত্যা করা হবে। তদনুযায়ী শিশুহত্যা চালু থাকলে রাজ্যে অর্থনীতিবিদরা শঙ্কিত হয়ে পড়েন। কারণ এর ফলে দেশে ভবিষ্যতে শ্রমশক্তি বিলোপ হয়ে যাবে। তাই সিদ্ধান্ত হয় একবছর শিশুহত্যা বন্ধ থাকলেও পরবর্তী বছর শিশুহত্যা বহাল থাকবে। ইসরাঈলে যে বছর শিশুহত্যা বন্ধ ছিল সে বছর হযরত হারুন আলাইহিস্‌সালাম জন্মগ্রহণ করেন। পরবর্তী শিশুহত্যা জারী রাখার বছরে জন্মগ্রহণ করেন হযরত মূসা আলাইহিস্‌সালাম।

শিশুপুত্রকে নিয়ে মূসার জননী ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন। কিন্তু মহান আল্লাহ্‌র অভিপ্রায় অনুযায়ী মা শিশুপুত্রকে একটি বাক্সে ভরে নীল নদীতে ভাসিয়ে দেন। মূসার এক বোন বাক্সটিকে নদীর তীর থেকে অনুসরণ করতে থাকে। শেষপর্যন্ত শিশু মূসা একজন কিবতীর হাতে ধৃত হন। কিবতীটি শিশু মূসাকে ফিরাউনের স্ত্রী আসিয়ার কাছে সমর্পণ করেন।

নিষ্পাপ শিশুটির অপরূপ রূপলাবণ্য আসিয়ার মনে তীব্র আলোড়ন সৃষ্টি করে। তিনি স্বামী ফিরাউনের কাছে শিশুটিকে পালক হিসেবে গ্রহণ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। ফিরাউন অনিচ্ছাকৃতভাবে তাতে সম্মতি প্রদান করেন। কিন্তু শিশুটিকে দুধ খাওয়ানো অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। কোন ধাত্রীর দুধই শিশুটি গ্রহণ করতে ইচ্ছুক ছিল না। শিশু মূসার বোন ব্যাপারটি লক্ষ্য করে তাদেরকে এমন এক পরিবারের সন্ধান দিতে সক্ষম বলে জানান যারা শিশুটিকে লালন পালনের ভার গ্রহণ করতে রাজি হতে পারে। শেষপর্যন্ত এভাবেই শিশুপুত্র মূসা তাঁর আপন জননীর কোলে ফিরে আসেন। ফিরাউন দুধ মায়ের জন্য ভাতা নির্ধারণ করে দেন। এভাবে মূসা আপন জননীর তত্ত্বাবধানে আসিয়ার পালকপুত্র হিসেবে বেড়ে ওঠতে থাকেন।

এরপর দীর্ঘ চড়াই উৎরাই পেরিয়ে হযরত মূসা আলাইহিস্‌সালাম আল্লাহ্‌র নবী রূপে আবির্ভূত হন। হযরত হারুন আলাইহিস্‌সালাম হন তাঁর সহযোগী। তাঁরা উভয়েই ফিরাউনের কাছে ইসলামের দাওয়াত দেন। ফিরাউন তাঁর কাছে নবী হিসেবে মু'জিজা দাবী করেন। আল্লাহ্ তাঁকে লাঠি ও হাতের মু'জিজা দান করেন। কিন্তু যার নসীবে আল্লাহ্‌র তরফ হতে কোন আলো নেই তার জন্য কোন মু'জিজাই গ্রহণযোগ্য নয়। ফিরাউন এসব মু'জিজাকে যাদুর কাজকর্ম বলে উড়িয়ে দেন। ফিরাউনের সমস্ত যাদুকর মিলে হযরত মূসা আলাইহিস্‌সালাম -এর মু'জিজার মোকাবিলায় ব্যর্থ হয়ে তাৎক্ষণিকভাবে মূসা ও তাঁর আনীত বাণীর প্রতি ঈমান এনে ফিরাউনের হাতে শাহাদাত লাভ করেন। এরপর ফিরাউন আরো উদ্ধত হয়ে ওঠলে ইসরাঈলীদের তাড়া করতে গিয়ে দলবলসহ লোহিত সাগরের পানিতে ডুবে মরেন। মরার মুহূর্তে তিনি ঈমান আনার ঘোষণা দেন কিন্তু তখন আর তার ঈমান গ্রহণযোগ্য হতে পারেনি কারণ ইতিপূর্বে ফিরাউনের কাছে অনেক নবুয়তী মু'জিজা উপস্থিত করা হয়েছিল। তিনি সবকিছু তখন প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।

পবিত্র কালামে পাকের একস্থানে বলা হয়েছে চোখ তো অন্ধ হয় না, অন্ধ হয় হৃদয়। যার হৃদয় অন্ধ তার চোখে সত্যের আলো ধরা পড়েনা। মানুষের হৃদয়ের অন্ধত্ব ঘুচানোর জন্য যুগে যুগে মহান আল্লাহ্‌র তরফ হতে নবী রাসূলগণ ধরাপৃষ্ঠে আগমন করেছেন। তাঁরা মানুষকে সত্যের পথে, আলোর পথে, মহত্ত্বের পথে, কল্যাণের পথে অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ভাষায় আহ্বান জানিয়েছেন। এ আহ্বান ছিল নিঃস্বার্থ। তাঁরা এর বিনিময়ে কোন মানুষের কাছে কোন প্রতিদান চান নি। তাঁদের প্রতিদান নির্ধারিত ছিল ও আছে মহা প্রভুর মহা ভাণ্ডারে। কিন্তু মানুষ অহংকারে স্ফীত হয়ে অত্যন্ত উদ্ধত ভঙ্গিমায় নবীদের সে আন্তরিক ও উদাত্ত আহ্বানকে প্রত্যাখ্যান করেছে। তারা আল্লাহ্‌র রজ্জুকে ধারণ করতে চায়নি ফলে তারা জীবনের মূলধারা থেকেই ছিটকে পড়েছে। তাদের সামনে খোলা ছিল উত্থানের সদর দরজা তারা বেছে নিয়েছে পতনের গোপন সুড়ঙ্গ। তাদেরকে আবে হায়াতের সন্ধান দেয়া হয়েছে তারা বেছে নিয়েছে মরণঘাতী বিষাক্ত অনল। আলোর হাজার বাহন হয়ে তাদেরককে ডেকেছে 'সিনাই পর্বত' অথচ তারা সাড়া দিয়েছে 'সামেরির গাই'য়ের কৃত্রিম ডাকে। তাদেরকে হাতছানি দিয়েছে 'হেরার রাজ তোরণ', তারা ফিরে গেছে আবু জাহেলের অন্ধকার কুঠরিতে। আবু লাহাবের উভয় হস্ত ধ্বংস হয়েছে আর তার অনুসারীর ধ্বংস হয়েছে জীবনের সকল অর্জন। জীবনের সকল সম্ভাবনাকে জলাঞ্জলি দিয়ে তারা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে সীমাহীন অন্ধকারের দিকে। শুভবুদ্ধির সকল কোশেশ তাদেরকে আর ফেরাতে পারছেনা কোন ক্রমেই। পরাজয়কে যারা বিজয় মনে করে জীবনের সকল আশাবাদ তাদের জন্য নিঃশেষিত হয়ে গেছে। তারা সুপার পাওয়ারের অন্ধ উপাসনায় সুপ্রীম পাওয়ারের কুদরতী শক্তিকে ভুলে গেছে ফিরাউনের অনুসারীর মতই।

সময় এসেছে মানুষ সিনাই পর্বতে আলোর দিকে যাবে না সামেরীর গাই কে পুজো করবে, তারা কি হেরার রাজতোরণের অভিযাত্রী হবে না আস্বাদন করবে আজাজিলের মেকি গুন্দম?

হযরত মূসা ও ফিরাউনের ঘটনায় মানব জাতির জন্য অনেক শিক্ষনীয় বিষয় রয়েছে। আল্লাহ্‌র কুদরতী শক্তির কাছে জাগতিক সকল ক্ষমতাই যে অতি তুচ্ছ তা যুগে যুগে প্রমাণিত হয়েছে। মানুষ ক্ষমতার মোহে অন্ধ হতে পারে, জ্ঞান করতে পারে ধরাকে সরা, কিন্তু নিজের পতনকে সে কোনদিনই ঠেকাতে পারবেনা।

মাইজভাণ্ডারী তরিকা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত নিজের শক্তিকে তুচ্ছ জ্ঞান করে আল্লাহ্‌র শক্তিকে আস্থাবান হতে সবসময়ই মানুষকে আহ্বান জানিয়ে আসছে।

– মুহাম্মদ ওহীদুল আলম। তথ্যসূত্র : ইন্টারনেট।

আত্তাওজিহাতুল্ বহিয়্যাহ্ বা সিজ্দাহ্ তাহিয়্যার সুপ্রমাণ পুঞ্জ

মূল:
কালজয়ী ইসলামী বিধান শাস্ত্র বিশারদ, মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত, গাউসে যমান, কুত্বে দওরান,
ইমাম আ'যমে যমান, শায়খুল ইসলাম, আল্লামা মাওলানা সৈয়দ আমিনুল হক ফরহাদাবাদী (কু.)
অনুবাদ: এস এম জাফর ছাদেক আল্ আহাদী

[দ্বীনি আচারের বিভিন্ন সূক্ষ্ম ও জটিল বিষয়ে আলেম ও বিদ্বজ্জনদের গবেষণার অন্ত নেই, তেমনি ভাষ্যেরও শেষ নেই। সময়ের সাথে সাথে বিবর্তিত চেতনার আলোকে ইতিহাসের ঘটনাবলীর মতো ধর্ম-দর্শন-আচার সম্পর্কেও নব নব ব্যাখ্যা ও ভাষ্য উৎসারিত হয়। এগুলো গবেষণা ও আয়াসলব্ধ ফসল বিধায় আগ্রহী হৃদয় ও মস্তিষ্ককে আকর্ষণ করে। 'সিজদা'-ও তেমন একটি বিষয়, যা আধ্যাত্মিক, দার্শনিক, ধর্মতত্ত্ববিদ, বিজ্ঞানী, কবি, ভক্ত-আশেকরা নিজ নিজ উপলব্ধি ও যুক্তির আলোকে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করতে প্রয়াসী হয়েছেন। সিজদার আক্ষরিক, তাত্ত্বিক, মরমী, বৈজ্ঞানিক ও শারীরবিদ্যাগত দিক নিয়ে অসংখ্য গ্রন্থ রচিত হয়েছে এবং হয়ে চলেছে। এ সম্পর্কে আল্লামা মওলানা সৈয়দ আমিনুল হক ফরহাদাবাদী (কুঃ)-এর 'আত্তাওজিহাতুল বহিয়্যাহ্' সুপ্রসিদ্ধ ও বহুল আলোচিত একটা গ্রন্থ, যা একদা মিশরের আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের আলেম ও যুক্তিবাদী শিক্ষকদেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল এবং প্রশংসাও পেয়েছিল। এই সূক্ষ্ম ও জটিল বিষয়ে আগ্রহী পাঠক-পাঠিকাদের জিগীষা ও কৌতূহলের দাবী (Academic Interest) মিটানোর প্রয়াসে এই গুরুত্বপূর্ণ ও আলোচিত পুস্তকের বঙ্গানুবাদ পত্রস্থ করা হচ্ছে।]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

অতএব জানা গেল যে, ফেরেশ্তাদের প্রতি সিজদার নির্দেশ দ্বারা দলিল দেয়া আমাদের জন্য যথার্থ-সঠিক এবং এ দলিল উপস্থাপনের সঠিকত্ব হযরত আদম আলাইহিস্সালাম ফেরেশ্তাদের জন্য নবী হওয়ার উপর নির্ভরশীল নয়; আর কোন নির্দেশ তকলীফী বা আবশ্যক বর্তানোগত বরঞ্চ তাশরীয়ী বা শরীয়তগত হওয়ার ক্ষেত্রে নবীর মধ্যস্থতা শর্ত নয়। এতে তনকিহাতুজ্জুন্নিয়ার সেই উক্তির বাতিলতা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, তার বক্তব্য- **"উক্ত নির্দেশ তাকবীনী বা সৃজন সংক্রান্ত নির্দেশই, তাশরীয়ী বা শরীয়তগত নির্দেশ নয়; কেননা আদম (আঃ) জান্নাতে ফেরেশ্তাদের জন্য নবী ছিলেন না এবং তারা এ সিজদার নির্দেশপ্রাপ্তির সময়ে তাঁর উম্মত ছিলেন না; অথচ আমাদের পূর্ববর্তী শরীয়তের সূচনা আদম আলাইহিস্সালামের নবুয়ত প্রাপ্তির পর থেকেই এবং তাঁর নবুয়তপ্রাপ্তি ঘটে জান্নাত থেকে পৃথিবীতে অবতরণের পরই।"** তাঁর এ দাবী প্রমাণার্থে তথায় যে সব দলিল এনেছেন, সবই তার আওতাধীন নিষ্ফলই, তা যথাস্থানে অচিরেই উল্লেখ করছি। আলোচ্য পর্যায়ে সারকথা হল, আল্লাহ্র খেতাব বা ঘোষণা তানজিযী বা চাহিদা পূরণার্থক সম্পর্ক সহকারে মোকল্লাফীন বা আদিষ্টজনদের কর্মের সাথে সম্পৃক্ততায় স্বয়ং সত্তাজাত ও শব্দগত বাণী হওয়ার দিক থেকেও তাশরীয়ী বা শরীয়তগত হুকুমই বটে। আর তাশরীয়ীটার (অর্থাৎ শরীয়তগতটার) মধ্যে যদি মোকাল্লাফীনদের (অর্থাৎ আদিষ্টজনদের) থেকে অন্তর্গতভাবে হলেও কর্ম সম্পাদনের আবশ্যক দাবী রাখে, তাহলে তা তাকলীফী অন্যথায় (অর্থাৎ আবশ্যক দাবী সম্বলিত না হলে) তাখ্রিয়ী অর্থাৎ উত্তম বা পছন্দনীয় বিষয় সংক্রান্ত। এতে পরিষ্কার হয়ে গেল যে, শরীয়তগত বিধান মাত্রই তাকবিনী (সৃজন সংক্রান্ত) খেতাব বা ঘোষণার অন্তর্ভূক্ত। এতদ্উভয়ের মধ্যে পার্থক্য শুধু অনাদিকালীন স্থায়ীত্ব আর সৃষ্ট নশ্বরতা নিয়ে এবং মোকাল্লাফের (তথা আদিষ্ট জনের) কর্মের সাথে সম্পৃক্ততার দিক দিয়ে। হাঁ, যে তাকবিনীর মধ্যে মোকাল্লাফের কর্মের সাথে সম্পৃক্ততা নেই, বরং সৃষ্টিজগত সৃজনের সাথে সম্পর্ক রাখে, যেমন كُن (হও) নির্দেশটি তাশরিয়ী বা শরীয়তগত বিষয় নয়; এটার ক্ষেত্রে কোন বিতর্ক নেই।

তবে তাকলীফীটা (তথা আবশ্যক হিসেবে বর্তানো নির্দেশটা) তাশরীয়ীরই (তথা শরীয়তগত বিধানেরই) এক প্রকার এবং ফিরিশ্তাদের প্রতি সিজদার নির্দেশ তাকলিফি বিধায় তাশরীয়ীর অন্তর্ভূক্ত অবশ্যই হবে। কেননা মোক্বহাম অর্থাৎ বিভক্তিকৃত বিষয় তার আক্বহাম অর্থাৎ প্রকারসমূহে ধর্তব্য হয়। উল্লেখিত নির্দেশটি যখন তাকলীফী নির্দেশই এবং ওয়াজিব সাব্যস্তকরণই যখন উক্ত তাকলীফী নির্দেশের অনিবার্য দাবী, তবে ওয়াজিব সাব্যস্ত হওয়াটা শরীয়ী বা শরীয়তগত হুকুম বিধায় প্রমাণিত হল যে, উক্ত নির্দেশ শরীয়তের অন্তর্গতই; যদিও তা নবীর মধ্যস্থতায় হয়নি। কেননা তা শরীয়তগত বিষয় না হলে এতদ্বারা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিবৃতি প্রদান করা বাতিলে পরিগণিত হওয়া অনিবার্য হয়ে দাঁড়ায়; যদিও তা ঘটনা বিবৃতিমূলক হয়। সুতরাং আল্লাহ্তায়ালা আমাদের মহান ধর্মগ্রন্থ পবিত্র কুরআনে উক্ত ব্যাপারে ঘটনা বিবৃত করার প্রেক্ষিতে তা আমাদের পূর্ববর্তী শরীয়তের অন্তর্ভূক্ত বলে জানাই গেল। অতএব এটা দ্বারা শরীয়তের বিধান সাব্যস্ত হবেই। কেন দৃষ্ট হবে না যে, আমাদের পূর্ববর্তী শরীয়ত থেকে তাদের পুরা শরীয়াত উদ্দেশ্যই নয়; বরং

তা থেকে যা আল্লাহ্‌তায়ালা বর্ণনা করেছেন মাত্র তা-ই উদ্দেশ্য। আর উক্ত নির্দেশের ব্যাপারে আল্লাহ্‌তায়ালা বিবৃতি প্রদান করেছেনই। অতএব এতদ্বারা দলিল উত্থাপন সঠিক হয় যে, আদম আলাইহিস্‌সালাম-এর জন্য সিজদাহ্ করা তাকলীফী নির্দেশের দ্বারা ফেরেশ্‌তাদের উপর ওয়াজিবই ছিল, তবে বুঝা যায় - ওটা মূলগতভাবেই মোবাহ বা জায়েজই। কেননা মূলগতভাবে যদি তা হারাম হয়, অনুপায়জনিত সমস্যার অনিবার্য দাবী ছাড়া আল্লাহ্ কর্তৃক তা ফিরিশ্‌তাদের উপর আবশ্যক বর্তানো যথার্থ হয়নি; কারণ অনুপায়জনিত সমস্যার অনিবার্য দাবী ছাড়া কোন নিষিদ্ধ বিষয়কে মোবাহ বা অনুমোদিত করা জায়েজ নয়। অথচ আদম আলাইহিস্‌সালামকে সিজদার ব্যাপারে ফিরিশতাদের উপর আবশ্যকভাবে বর্তানোর উক্তরূপ কোন অনিবার্য দাবী যে নেই তা সুস্পষ্ট। অতএব ওটা যখন মৌলিকভাবে মোবাহ্‌ই ছিল এবং নির্দেশ দ্বারাই তা ফিরিশ্‌তাদের উপর ওয়াজিব হয়েছে, তবে নির্দেশ পালনার্থে তারা তাঁকে সিজদাহ্ করার পর তাদের থেকে সেই ওয়াজিবত্বের বিলোপ ঘটে; কেননা 'আমরে মোতলাক' বা শর্তবদ্ধতাহীন নির্দেশ বারংবারতার সম্ভাবনা রাখেনা। কিন্তু মূলগত মোবাহ্ বা জায়েজ হওয়াটা বিদ্যমান থেকেই যায়; বরং ওটা মোস্তাহাব হওয়ার হুকুম অবশিষ্ট থাকে। কেননা নির্দেশ দ্বারা সাব্যস্ত ওয়াজিব বিষয়ের সর্বনিম্ন পর্যায় হল মোস্তাহাবই; এমন কি তারা (ফিরিশ্‌তাগণ) যদিও তাঁকে (হযরত আদম আলাইহিস্‌সালামকে) দ্বিতীয়বার সিজদাহ্ করেছিল, তাহলে ঐ সিজদাটি তাদের জন্য মোস্তাহাবই ছিল। এতে 'আমরে মোতলাক' বা শর্তবদ্ধতাহীন নির্দেশের বারংবারতা আবশ্যক হয়ে দাঁড়ায় না; সেটা তখনই মাত্র আবশ্যক হয়ে দাঁড়ায়, যখন আদিষ্ট বিষয়ে তাদের উপর সাব্যস্ত ওয়াজিবের হুকুম দ্বিতীয়বার বর্তানো হয়; অথচ বিষয়টি সেরূপ নয়। বরং তারা শুধুমাত্র মোস্তাহাব বা মোবাহ্ কার্য সম্পাদনে এগিয়ে আসলো বলেই হুকুম বর্তানো হচ্ছে; যদ্বারা 'আমরে মোতলাক'এর বারংবারতা আবশ্যক হয়ে দাঁড়ায় না। এতদ্বারা আনকিহাতুজ্জুন্নিয়ায় উল্লেখিত সেই দাবীর বাতিলতা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, **তাঁর কথায়- "সিজদাহ্ তাহিয়্যাহ্ মোবাহ হওয়ার দলিল আনয়নটা 'আমরে মোতলাক' বা শর্তবদ্ধতামুক্ত নির্দেশ বারংবারতার উপযোগী হওয়ার উপর নির্ভরশীল।"** আসলে সিজদাটা মোবাহ্ কিংবা মোস্তাহাব হওয়ার পক্ষে দলিল আনয়ন 'আমর' বা নির্দেশটার কার্যকারিতায় বারংবারতার উপযোগী হওয়ার উপর নির্ভর করছেনা। কেননা মোবাহ্ কিংবা মোস্তাহাব হওয়ার (টীকা: প্রসঙ্গ কথায় মোস্তাহাব হওয়ার হুকুম অবশিষ্ট থাকে) আবহমান অতীতের অন্তর্গত তা মোস্তাহাব হওয়ার হুকুম বহাল রয়েছে বিধায় হযরত ইয়াকুব আলাইহিস্‌সালাম ও তাঁর সন্তানগণ সেই মোস্তাহাব বহাল থাকা দৃষ্টেই হযরত ইউসুফ আলাইহিস্‌সালামকে সিজদাহ্ করেছিলেন। অতএব তাঁদের জন্য সিজদাহ্ করার নির্দেশ অবতীর্ণ হওয়ার প্রয়োজন নেই। এতদ্বারা ফেন্দীর মোনাজারায় কথিত সেই উক্তির বাতিলতা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, **তাঁর কথায়- আর স্পষ্ট যে, তাঁরা নিজেদের পক্ষ থেকে সিজদাহ্ করেছিলেন আল্লাহ্‌তায়ালার কোন নির্দেশ নেই।"** এ দাবীর বাতিলতা কারো উপর অস্পষ্ট নয়; কেননা মোস্তাহাব বিষয়কে তো বটে, বরং মোবাহ্ বিষয়কেও গ্রহণ করে নেয়া নির্দেশ অবতীর্ণ হওয়া ব্যতীতই জায়েজ। অতএব তৎকালীন শরীয়তে তা 'নুদুব' বা মোস্তাহাব হিসেবে জাহাল থাকা দৃষ্টে তাঁরা যখন তা গ্রহণ করে নিয়েছেন, তাতে সুস্পষ্ট যে, ওটা দ্বারা দলিল উপস্থাপন আমাদের জন্য সঠিকই হবে। (মাওলানা ওবাইদুল আকবর)

এ পর্যায়ে তা আদেশগত বা হুকুমকৃত বিষয় নয় যে, যদ্বারা তা মোবাহ্ কিংবা মোস্তাহাব হওয়ার পক্ষে দলিল উপস্থাপনে উক্তরূপ সমস্যা দেখা দেবে! বরং 'আমর' (নির্দেশ) দ্বারা সাব্যস্ত ওয়াজিব বহাল থাকার পক্ষে দলিল আনয়ন করলেই সেই সমস্যাটা দেখা দিত; অথচ ঐ মতের দাবীদার কেউ নয়।

অতএব উক্ত নির্দেশই বুঝাচ্ছে যে, সিজদাটি মূলত মোবাহ্; কিন্তু আমর বা নির্দেশের বিধি মোতাবেক তাহিয়্যাহ্-অভিবাদন হওয়ার প্রেক্ষাপটে তাতে মোস্তাহাবের অর্থ বিদ্যমান। তাহিয়্যাহ্ বা সম্মানার্থক অভিবাদন প্রত্যেক যুগে এমনকি ফিরিশ্‌তাদের নিকটও সুন্নাত তথা নির্ধারিত নীতি হিসেবে প্রচলিত। আর ফিরিশ্‌তা ভিন্ন অন্যদের বেলায় বরঞ্চ প্রথমবার নির্দেশ কার্যকর করা দ্বারা ওয়াজিব তিরোহিত হওয়ার পর ফিরিশ্‌তাদের বেলায়ও উক্ত মোবাহ্ ও মোস্তাহাবের হুকুম বলবৎ রয়েছে। এতে জানা গেল যে, উক্ত সিজদাহ্ মোবাহ্ এবং মোস্তাহাব হওয়ার পর্যায়ে আদম আলাইহিস্‌সালাম-এর জন্য 'খাস্' বা নির্দিষ্ট নয়; যদিও তা ফিরিশ্‌তাদের উপর ওয়াজিব হওয়ার পর্যায়ে তাঁরই জন্য নির্দিষ্ট। মূলতঃ মোবাহ্ এবং মোস্তাহাব বিষয়াবলী কাউকে বাদ দিয়ে অন্য কারো জন্য নির্দিষ্ট হওয়ার কোন হেতু নেই। তার দৃষ্টান্ত আমাদের শরীয়তে যেমন তাহাজ্জুদের নামায, যা আল্লাহ্‌র বাণী- فتهجد به نافلة لك (অর্থাৎ অত:পর রাতের কিছু অংশে আপনার জন্য অতিরিক্ত স্বরূপ তাহাজ্জুদ আদায় করুন।) ভিত্তিক আমর বা নির্দেশের বিধির আওতায় আমাদের নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার জন্য ফরয ছিল। অতএব তা ওয়াজিব তথা ফরজ হওয়ার পর্যায়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার জন্য নির্দিষ্ট হলেও নুদুব বা পুণ্যময় কাজ তথা সুন্নাত হওয়ার পর্যায়ে তাঁর জন্য নির্দিষ্ট নয়। তার দৃষ্টান্ত আমাদের পূর্ববর্তী শরীয়তে যেমন- 'আইয়ামে বায়জ' এর রোজা (প্রতি চন্দ্রমাসের তের, চৌদ্দ ও পনর তারিখে রোজা রাখা); তা আমাদের আদি পিতা হযরত আদম আলাইহিস্‌সালামের উপর ফরজ ছিল, অথচ তিনি ছাড়া অন্যান্যদের জন্য 'মনদুব' বা মোস্তাহাব হিসেবে বিদ্যমান।

অত:পর উক্ত সিজদাটি যখন মূলগত মোবাহ্ হওয়া দৃষ্টে আদম আলাইহিস্‌সালামের জন্য নির্দিষ্ট নয়, একই সাথে 'আমর' বা নির্দেশের বিধির আওতায় তাহিয়্যাহ্-অভিবাদন হওয়ার প্রেক্ষিতে

তাতে মোস্তাহাবের অর্থ বিদ্যমান রয়েছে বিধায় উক্ত সিজদার মাধ্যমে বাদশাহের অভিবাদন আমাদের পূর্ববর্তী শরীয়তে মনদুব বা মোস্তাহাবই সাব্যস্ত হয় - এমত ব্যাখ্যা ব্যাপক সংখ্যক তাফসীর গ্রন্থে বিদ্যমান।

ইবনে জরীর স্বীয় তাফসীরে বলেন-

انى يعقوب وبنوه ودخلوا على يوسف عم فلما راوه وقعوا سجودا وكانت تلك تحية الملوك فى ذلك الزمان

অর্থাৎ- "ইয়াকুব আলাইহিস্‌সালাম এবং তাঁর সন্তানগণ এসে ইউসুফ আলাইহিস্‌সালামের নিকট (রাজপ্রাসাদে) প্রবেশ করত যখন তাঁকে দেখতে পেলেন, তখনই তাঁরা সিজদায় পড়লেন। যে যুগে বাদশাহ্‌র তাহিয়্যাহ্ অভিবাদন ছিল ওটাই।" তাফসীরে জাহেদীর মধ্যে আছে- وتحية الامم الماضية بالسجود كالسلام অর্থাৎ "অতীতকালীন উম্মতগণের তাহিয়্যাহ্-অভিবাদন সিজদাহ্ সহযোগে প্রচলিত ছিল; সালামেরই মত।"

অতএব জানা গেল, ইউসুফ আলাইহিস্‌সালামের জন্য ভাইগণের সিজদাহ্‌টা সম্মানজনিত তাঁরই জন্য ছিল; তাঁকে খুঁজে পাওয়ার কারণে কৃতজ্ঞতার সিজাদাহ্ স্বরূপ আল্লাহ্‌র জন্য ছিলনা। যেমনটি তানকিহাতুচ্ছুন্নিয়া প্রণেতা তাফসীরে কবীরের বক্তব্যের উপর নির্ভর করে সেরূপ ধারণাই করল যে, তাতে উল্লেখ আছে-

ان المراد بهذه الاية انهم خروا له اى لا دل وجدانه سجد لله تعالى حاصل الكلام ان ذلك السجود كان سجود الشكر لله تعالى فالمسجود هو الله تعالى الا ان ذلك السجود انما كان لاجله

অর্থাৎ- এ আয়াতের উদ্দেশ্য যে, তাঁরা তাঁরই জন্য ঝুঁকে পড়ল অর্থাৎ তাঁকে খুঁজে পাওয়ার কারণে আল্লাহ্‌র জন্যই সিজদায় পড়ল। সার কথা, উক্ত সিজদাহ্ শোকরিয়ার সিজদাহ্ স্বরূপ আল্লাহ্‌র জন্যই ছিল। অতএব সিজদাটি করা হয়েছিল আল্লাহ্‌কেই, কিন্তু উক্ত সিজদাহ্ তাঁর (অর্থাৎ ইউসুফ আলাইহিস্‌সালামের) কারণেই ছিল।" এ অভিমতটি তেমনই দুর্বল, যেমন আদম আলাইহিস্‌সালাম ফিরিশ্‌তাদের সিজদার কেবলা হওয়ার অভিমতটি দুর্বল বলে প্রমাণিত, যা আমরা ইতিপূর্বে দলিল সহকারে বিস্তারিত বর্ণনা করেছি। আর আল্লাহ্‌তা'য়ালার বাণী رايتهم لى ساجدين الاية অর্থাৎ- "তাদেরকে দেখেছি আমারই জন্য সিজদাহ্‌কারী হিসেবে"। আয়াতটি প্রমাণ করে যে, নিশ্চয় ভাইগণের সিজদাটি শুধুমাত্র ইউসুফ আলাইহিস্‌সালামের সম্মানার্থেই ছিল; তাঁকে খুঁজে পাওয়ার কারণে শোকরিয়া স্বরূপ আল্লাহ্‌র জন্য নয়। কেননা তার মধ্যকার (لى অর্থাৎ আমারই জন্য) জমীরে মাজরারটি তথা উত্তম পুরুষের দিকে সম্বন্ধযুক্ত জের বিশিষ্ট সর্বনামটি নির্দিষ্টকরণার্থকই। অত:পর ওটাকে (لى সর্বনামটিকে) ساجدين (সিজদাহ্‌কারী শব্দের অগ্রবর্তী করাটা আরো একটি নির্দিষ্টকরণ বটে। তা থেকে বুঝা যায়, উক্ত সিজদাহ্‌টি তাঁরই জন্য ছিল; তাঁকে খুঁজে পাওয়ার কারণে কৃতজ্ঞতা স্বরূপ আল্লাহ্‌র জন্য নয়। এরই ভিত্তিতে আল্লাহ্‌তা'য়ালার বাণী- خروا له سجدا (অর্থাৎ- তাঁরা, তাঁরই জন্য সিজদাবনত হয়ে পড়ল) আয়াতস্থ (له অর্থাৎ তাঁরই জন্য-এর) লামটি ও নির্দিষ্টকরণার্থক বটে; আজল বা কারণ বর্ণনার্থক কখনো নয়। কেননা উক্ত অর্থে তাঁকে খুঁজে পাওয়ার কারণার্থক হলে ভাইগণের ষড়যন্ত্রের কোন অর্থ না হওয়ার জটিলতা দেখা দেয়। কারণ এ পর্যায়ে সিজদাহ্‌টা আল্লাহ্‌র জন্য হয় বিধায় ভাইগণের ষড়যন্ত্রের কারণ হিসেবে সঠিকই হয়না। অথচ হযরত ইয়াকুব আলাইহিস্‌সালামের উক্তির বিবৃতি দিয়ে আল্লাহ্‌তা'আলা বলেছেন-

قال يابنى لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيدوا لك كيدا

অর্থাৎ: "ইয়াকুব আলাইহিচ্ছালাম বললেন, প্রিয় বৎস! তোমার স্বপ্ন তোমার ভাইগণের কাছে প্রকাশ করোনা, তাহলে তারা তোমার বিরুদ্ধে জঘন্য ষড়যন্ত্র করবে।" অতএব সিজদার কারণে ভাইগণের ষড়যন্ত্রের ব্যাপারটাই ঘোষনা করে যে, উহা ইউসুফ আলাইহিস্‌সালামের সম্মানের জন্যই ছিল, তাঁকে খুঁজে পাওয়ার কারণে আল্লাহ্‌র কৃতজ্ঞতা স্বরূপ নয়। এতদ্বারা তানকিহাতুচ্ছুন্নিয়ার সেই উক্তি তিরোহিত হয়ে যায় যে, তার কথায়- **"তাছাড়া তাতে শোকরের সিজদাহ্ এবং ইউসুফ আলাইহিস্‌সালামের স্বপ্ন বাস্তবায়নের ব্যাপারটাও রয়েছে অর্থাৎ উহা ইউসুফ আলাইহিস্‌সালামের সাথে নির্দিষ্ট"** এ সিজদাহ্ অর্থাৎ ইউসুফ আলাইহিস্‌সালামের জন্য ভাইগণের সিজদাটা যদিও মেনে নেয়া হয় যে, উহা তাঁর স্বপ্নের তাবিল বা ব্যাখ্যা ও বাস্তবায়নে হওয়ার অবকাশ রাখে; কিন্তু এতদ্ সত্ত্বেও উহা তাঁর সম্মানার্থে হওয়াকে বাধাগ্রস্ত করেনা। কেননা নিদ্রাবস্থায় দেখা স্বপ্ন যদি জাগ্রত অবস্থায় হুবহু ঘটে যায়, সেই বাস্তবে ঘটে যাওয়াকেও উক্ত স্বপ্নের তাবিল বা ব্যাখ্যা বলে আখ্যায়িত করা হয়। এতএব এহেন অর্থের তাবিল, উহা সম্মানের জন্য হওয়াকে বাধাগ্রস্ত করেনা। কেননা ব্যাখ্যান্তরে তিনি স্বপ্নে দেখেছিলেন যে, তাঁর ভাইগণ তাঁকে সিজদাহ্ সহকারে সম্মান করছেন[৩] এবং জাগ্রত অবস্থায় তা বাস্তবে সংঘটিত হয় মিশরে রাজসিংহাসনে সমাসীন হওয়ার অধিকার লাভের পর। এতে স্পষ্ট হয়ে গেল যে, সিজদাহ্‌টা স্বপ্নের ব্যাখ্যা স্বরূপ হওয়া এবং সম্মানার্থে হওয়ার মধ্যে কোন বিরোধ নেই। এতএব ভাল করে বুঝে নিন।

প্রসঙ্গ কথা: (৬) ভাইগণ তাঁকে সিজদাহ্ করছেন মর্মে স্বপ্নে দেখার কথাটা তাবির বা ব্যাখ্যার মর্মানুসারে বলা হয়েছে। কুরআনের বর্ণনানুসারে শৈশবে দেখা তাঁর মূল স্বপ্নটা ছিল- এগারটি নক্ষত্র, সূর্য এবং চাঁদ তাঁকে সিজদাহ করতে দেখেছিলেন। ঐ স্বপ্নের তাবিল বা ব্যাখ্যা স্বরূপ বাস্তবে যা সংঘটিত হয়েছিল; তা হল- তিনি যখন মিশরের রাজসিংহাসনে সমাসীন হলেন তখন ঘটনাক্রমে স্বীয় এগার ভাই, পিতা এবং সম্মা (তিনি আপন খালাম্মাও) তাঁকে সিজদাহ করেছিলেন। অতএব বাস্তবতায় এগার নক্ষত্রের ব্যাখ্যা এগার ভাই হওয়াতে- ভাইগণ তাঁকে সিজদাহ করছেন মর্মে স্বপ্নে দেখার কথায় কোন বৈপরীত্য নেই। (অনুবাদক)

(চলবে)

আঈনায়ে বারী ফি তরজুমাতি গাউসিল্লাহিল আ'যম মাইজভাণ্ডারী বা 'গাউসুল্লাহিল আ'যম মাইজভাণ্ডারীর 'জীবন চরিত' এ প্রভুর দর্পণ'

মূলঃ

যুগের মনসূর, প্রেমাস্পদের নূরী আননের প্রেমবিভোর, শরীয়তের মহাজ্ঞানী, মারফতের বিজ্ঞানী, ত্বরিকত বিদ্যার পরিবেষ্টনকারী, হাকিকত বিজ্ঞানে অভিজ্ঞ সর্বসম্মানিত বাহরুল উলুম জনাব মাওলানা আবুল বরাকাত সৈয়দ মুহাম্মদ আব্দুল গণি আচ্ছাফী আল্ মকবুল কাঞ্চনপুরী কদ্দাসাল্লাহু সিররাহুন্নূরী

ভাষান্তরঃ

● বোরহান উদ্দীন মুহাম্মদ শফিউল বশর ●

আরবী ফার্সী, উর্দূ ও হিন্দি ভাষার সমন্বয়ে এক অনন্য গ্রন্থ 'আঈনায়ে বারী ফি তরজুমাতি গাউসিল্লাহিল আ'যম মাইজভাণ্ডারী বা 'গাউসুল্লাহিল আ'যম মাইজভাণ্ডারীর 'জীবন চরিত' এ প্রভুর দর্পণ' ইসলাম ধর্মদর্শনের নিখাদ দর্শন কলমের আঁচড়ে যুক্তি-প্রমাণের দৃঢ় বাধনে দীপ্তি ছড়িয়েছে। প্রতি মূহূর্তে চমকের দোলায় চমকে উঠে পাঠক। উন্মোচিত হয় বিবেকের রুদ্ধদ্বার, উদ্বেলিত হয় অনন্ত প্রেমাবেগ। অপসারিত হয় দ্বিত্বের পর্দা। গ্রন্থটি প্রত্যেক খোদা অন্বেষীর জন্য অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছার যোগ্য গাইড লাইন। মুরিদ বা উদ্দেশীর জন্য মুরাদ বা উদ্দেশিত। রুগ্নান্তরের চিকিৎসায় একই সাথে ঔষধ, ব্যবস্থাপত্র ও অভিজ্ঞ চিকিৎসক।

সূফি দর্শন আজ কিছু সংখ্যক মতলববাজের খপ্পরে পড়ে নিজস্ব রূপ-যৌবন তথা স্বকীয়তা হারাতে বসেছে। সূফি বেশধারী ব্যবসায়ীদের প্রতারণায় ফেঁসে দ্বীন-দুনিয়া উভয় কুলহারা মানুষ এ পবিত্র দর্শনকে ঘৃণার থুথু ছিটিয়ে দিচ্ছে গাদায় গাদায়। বিশেষতঃ নিরেট সূফি দর্শনের যুগোপযোগী সংস্করণ মাইজভাণ্ডারী ত্বরিকা সম্পর্কে বিভ্রান্তিতে নিপতিত মানুষ নিজেদের অজ্ঞাতে মন্দ বলছে মাইজভাণ্ডারীদেরকে। এহেন পরিস্থিতিতে সূফি দর্শন ও মাইজভাণ্ডারী ত্বরিকার নির্ভেজাল দর্শন বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষের সমীপে তুলে ধরার নিমিত্তে উক্ত গ্রন্থটি বিভিন্ন ভাষায় ভাষান্তরিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

ইলহামী জ্ঞানের সফল ভাষ্যকার বাহরুল উলুম আল্লামা মকবুল রচিত আঈনায়ে বারী ফি তরজুমাতি গাউসিল্লাহিল আ'যম মাইজভাণ্ডারী বা 'গাউসুল্লাহিল আ'যম মাইজভাণ্ডারীর 'জীবন চরিত' এ প্রভুর দর্পণ' গ্রন্থটি সূক্ষ্ম জ্ঞানের অতল সমুদ্র। সিন্ধু তলের মুক্তা আহরণ ডুবুরীর পক্ষেই সম্ভব। কৃতি লেখক ও অনুবাদক জনাব বোরহান উদ্দীন মুহাম্মদ শফিউল বশর অতি সাহসিকতার সাথে উক্ত গ্রন্থের সাবলীল অনুবাদ সম্পন্ন করেছেন। আলোকধারার পাঠকদের জন্য ধারাবাহিকভাবে তা প্রকাশ করা হচ্ছে।

পূর্ব প্রকাশিতের পর:

ষষ্ঠ পরতও বা রুশ্নি: প্রতিনিধিত্বের মিথ্যা দাবীতে নায়েবে শয়তানে পরিণত হয়:

প্রকাশ থাকে যে, উপরোল্লিখিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, উক্ত ফানায়ে সালাসা ত্রিবিধ বিনাশস্তর অতিক্রম করা ছাড়া কেউ আলেমে হক্কানী, ফাযেলে রব্বানী এবং আল্লাহ ও রাসূলের প্রতিনিধি কখনো হতে পারেনা। যে ব্যাক্তি এ স্তরত্রয় অতিক্রম না করে আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের প্রতিনিধিত্বে দাবী করবে এবং নিজেকে আল্লাহর খলিফা ও নবীর নায়েব ধারণা করবে মূলতঃ সে মিথ্যাদাবীদার মাত্র। বরং সে হতভাগা এ মিথ্যাদাবী দ্বারা আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি মিথ্যাপবাদ দেয় এবং তাঁদের সাথে শত্রুতা প্রচেষ্টায় কোমর বেঁধে নামে। বরং যে ব্যক্তি বেলায়ত ও ইরশাদের মিথ্যাদাবী করবে সে মুসায়লামা কাজ্জাবের মত শয়তানের প্রতিনিধি।

ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا 'এবং ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক অত্যাচারী কে? যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর মিথ্যাপবাদারোপ করে।' (সূরা হূদ ১৮ নং আয়াত) সুবহানাল্লাহ! কতইনা আজব তামাশা যে, নিজে পথভ্রষ্ট হয়ে অন্যকে হিদায়ত করতে কোমর বেঁধে আছে! যে বেলায়ত ও পূর্ণাঙ্গ হিদায়ত অর্জন আলেমে হক্কানী ও ওলীয়ে রব্বানীগণের উপরই নির্ভরশীল। কেননা, আল্লাহর ফয়য-বরকত কোন কামিল-মুকাম্মিলের মাধ্যমে ব্যতীত অর্জিত হয়না। কামিল-মুকাম্মিল ঐ ব্যক্তি যিনি গোপনে আল্লাহর সাথে সম্পর্কিত আর প্রকাশ্যে সৃষ্টির সাথে সম্পৃক্ত; যেমন নবী, রাসূল ও নায়েবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াআলা আলিহী ওয়াসাল্লামা। সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে এটি অকল্পনীয়। কুরআনে পাকে আল্লাহ্‌তা'আলা ইরশাদ ফরমান,

لو كان في الارض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا

'যদি ভূপৃষ্ঠে ফিরিশ্‌তাও সুস্থিরভাবে চলাফেরা করতো তবে অবশ্যই আমি তাদের প্রতি আসমান থেকে রাসূল রূপে ফিরিশ্‌তা প্রেরণ করতাম।' (সূরা বনী ইস্রাঈল ৯৫ নং আয়াত)

যে ব্যক্তি ওলী আল্লাহদের মাধ্যম ব্যতীত হিদায়ত অন্বেষণের সংকল্প করে সে পেচক ও বাদুড়ের ন্যায় ভ্রষ্টতার অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়েছে। আর যে কেউ লেংড়া ও খোঁড়াবস্থায়ও আউলিয়ায়ে কেরামের সান্নিধ্যে গমন করেছে সে ঐ ত্রুটি তথা ভ্রষ্টতার অন্ধকার থেকে পরিত্রাণ পেয়েছে এবং মৌলিকতার সমুদ্রে ডুব দিয়েছে।

আল্লাহ! আল্লাহ! ইনসাফতো পৃথিবী হতে উঠে গিয়েছে। এটিতো মন্দ ও ফিৎনার যুগ। আলেমে রব্বানী যাঁরা ছিলেন তাঁরাতো দুনিয়া হতে উত্তোলিত হয়েছেন। এখন মুসলমানী কিতাবে আর মুসলমান গোরস্থানে। চলমান সময়তো গোমরাহীর যুগ। ভ্রষ্টের নিকটতো ভ্রষ্টতাই পছন্দনীয়। যেমন দুষ্টপ্রজা তেমন অত্যাচারী রাজা, যেমন অবাধ্য পশুপাল তেমন বর্বর রাখাল এবং যেমন মুর্দা তেমন ফিরিশ্‌তা। বাতেলদের নিকট বাতুলতাই পছন্দনীয়। মিথ্যুকের কাছে মিথ্যাই পুণ্যকাজ। কথিত আছে যে, এক বোকা ছাত্র নাহু শাস্ত্রের ছোট্ট একটি পুস্তিকা নিয়ে একজন নাহবী শিক্ষকের নিকট গেল। শিক্ষক তাকে ضرب زيد عمرو এর অর্থ 'যায়েদ আমরকে প্রহার করল' বলামাত্রই ছাত্র জিজ্ঞাসা করল, বিনাদোষে কেন মেরেছে? শিক্ষক বল্‌লেন, যায়েদ ও আমর এ দু'টি কাল্পনিক নাম, যা উদাহরণ হিসেবে শব্দে হরকত (যের, যবর ও পেশ) প্রকাশে ব্যবহৃত। শিক্ষক বারংবার একথাটি বুঝাতে ছিল আর সে স্থূলবুদ্ধি ছাত্র তা না মেনে বরাবরই জিজ্ঞাসা করতে লাগল, কি অপরাধে যায়েদ আমরকে মেরেছে? অগত্যা শিক্ষক বললেন, যায়েদ ও আমর সহোদর ভাই এবং উভয়ের নাম তিন অক্ষরে গঠিত। আমর একটি واء (ওয়া) চুরি করে নিজের নামে সংযুক্ত করায় তার নামে যায়েদ থেকে একটি অক্ষর অতিরিক্ত হয়েছে। যায়েদ একথা জানতে পেরে আমরকে প্রহার করেছে। কেননা, সীমালংঘনকারী শাস্তির যোগ্য হয়। বোকা, নির্বোধ, স্থূলবুদ্ধি ও বাতিল বোধসম্পন্ন ছাত্র এ বাতিল ব্যাখ্যাটি পছন্দ করেছে। মহান আল্লাহ্‌তা'আলা পাক কালামে ইরশাদ করেছেন, الخبيثات للخبيثين 'কলুষিতা কলুষিতের জন্য'। (সূরা নূর ২৬ নং আয়াত) সংক্ষেপিত। মন্দলোক মন্দের প্রতি আকৃষ্ট আর পবিত্র ব্যক্তি পবিত্রের অন্বেষী। বাস্তবপক্ষে দুনিয়ার গু-গোবরে পার্থিব আলেমদের চক্ষু অন্ধ করে দিয়েছে। পার্থিব লোভ-লালসা তাদেরকে গোমারাহীর অতল গহ্বরে নিমজ্জিত করে দিয়েছে। মহান আল্লাহ জল্লা জালালাহু বলেন,

مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا

'যাদেরকে তাওরাত দেওয়া হয়েছে অতঃপর তা বহন করেনি অর্থাৎ আমল করেনি সে সকল লোকদের অবস্থা ঐ গাধার ন্যায় যে গাধা কিতাবের বোঝা বহন করে।' (সূরা জুম'আ ৫নং আয়াত) আলেমে দুনিয়া লোককে দেখানোর জন্য অন্যদের নসিহত করে। যদি তাদের অন্তরে এ নসিহতের প্রভাব পড়তো তবে তাদের শরীর টুকরো-টুকরো হয়ে যেত। বিচার্য যে, যাদু-মন্ত্রে দৈত্য-দানবের নাম মন্ত্রসিদ্ধের উপর প্রভাব বিস্তার করে অথচ নসিহতে দৈত্য দানবের স্রষ্টা আল্লাহ পাকের নামেও কোন প্রকার প্রভাব পড়ছেনা। যদি তাঁরা ওলামায়ে রব্বানী হতো তবে আল্লাহ্‌র নাম মুখে নিতেই শরীর কম্পিত এবং প্রেমবিভোরতায় মূর্চ্ছাগত হতো। আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেছেন,

انما المؤمنون اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم ايته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون

'পূর্ণাঙ্গ মু'মিনতো তারাই, যখন আল্লাহ্‌কে স্মরণ করা হয় তখন তাঁদের হৃদয় প্রকম্পিত হয় এবং যখন তাঁদের নিকট তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করা হয়, তখন তাঁদের ঈমানে উন্নতি হয় নিজেদের প্রতিপালকের উপর নির্ভর করে।' (সূরা আনফাল ২নং আয়াত) অর্থাৎ ঐ ব্যক্তিই পরিপূর্ণ ঈমানদার, যখন তাঁর সম্মুখে আল্লাহ্‌র স্মরণ করা হবে তখন তাঁর অন্তর আল্লাহ্‌র মহত্বের ভীতি, চিরস্থায়ী শ্রেষ্ঠত্বের ভাবনা ও অনুগ্রহ দয়ার তুলনায় নিজ আমলের স্বল্পতা অনুধাবন করে ভীত, সন্ত্রস্ত হয়। যখন তাঁদের সামনে আল্লাহ্‌র আয়াত অর্থাৎ কুরআন পড়া হয়, সে আয়াত শ্রবণে তাঁদের ঈমানের দীপ্তি বাড়তে থাকে। এতে প্রমাণিত হয় যে, তিলওয়াত দ্বারা তাঁদের বাতেনী বিশ্বাস দৃঢ় হয় এবং বাহ্যিক বহিঃপ্রকাশ হিসেবে অধিকতর আনুগত্য প্রকাশ পায়।

জেনে রাখা প্রয়োজন যে, প্রকৃত ঈমান হচ্ছে একটি জ্যোতি; অন্তরের আয়না যত বিস্তৃত হয় সে নূরও অন্তরে ততটুকু দীপ্তিময় হয়। অতএব, যে সকল ব্যক্তি আহলে দিল তাঁদের সম্মুখে কুরআন শরীফ পড়া হলে তার বরকতে তাঁদের অন্তরের আয়না স্বচ্ছ হয় এবং ঈমানের জ্যোতি বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। আর ঐ ব্যক্তিগণ খোদার সৌন্দর্যের নূরে ডুব দেয় এবং আপন প্রতিপালকের উপরই নির্ভর করে। দুনিয়া ও দুনিয়াদারের উপর কখনো ভরসা করেনা। যে কেউ আল্লাহ্‌র জ্যোতির প্রভাবে জ্যোতির্ময় হয় তার কাছে আল্লাহ ভিন্ন কারো পরওয়া থাকেনা। এমনকি তাঁর আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কিছু দৃষ্টিগোচর পর্যন্ত হয়না।

পংক্তি

هر كه مستغرق بدريائے شهود حق شود ✿ بيگمان او فارغ از كشتى و از زورق شود
هر كه او شد غرقه در دريا بجو دريا نديد ✿ هر چه باشد غير دريا است بر وے ناپديد

নিমগ্ন হলো যে জন খোদার ধ্যানসাগরে,
নৌকা, বৈঠা, দাড় ও পাল সে কি করে?
সমুদ্রে নিমজ্জিত যে, সাগর বিহন কিছু নাহি হেরে,
দরিয়া বিনে আছে যা সবই কন্টক তার তরে।

বিচারের দৃষ্টিতে চিন্তা করা হলে, দুনিয়াদারের ঈমানেও সন্দেহ রয়েছে। যেমন উক্ত আয়াতে উল্লিখিত 'ইন্নামা' শব্দটির পরিবেষ্টন এটার পরিষ্কার প্রমাণ; যদিবা মুফাস্সেরিনগণ জাহেরী ইসলামের সম্মানার্থে তাবিল বা ব্যাখ্যা করেছেন। হযরত আরিফ রুমী (রহ.) বলেন,

اہل دنیا کافران مطلق اند ✤ روز و شب در بیخ بق و در زق اند

'দুনিয়াদারগণ নিশর্ত কাফির হয়, দিবারাত্রি বকাবকায় নিমগ্ন রয়।'

সপ্তম পরতও বা রশ্মি: দুনিয়াদারের ভ্রষ্টতার হেতু:

প্রকাশ থাকে যে, দুনিয়াদেরদের গোমরাহীর হেতু অনেক। কিন্তু তম্মধ্যে দু'টি কারণ অত্যন্ত বলিষ্ঠ ও প্রকাশ্য। প্রথমতঃ লোভ ও দুনিয়াপ্রীতি। মহানবী (দ.) ইরশাদ করেন,

ان ملاک الدین الورع وهلاکه الطمع 'নিশ্চয় দ্বীনের মূলধন হচ্ছে পরহেযগারী এবং ধ্বংস লোভে।' নবী করীম (দ.) বলেন,

حب الدنیا راس کل خطیئة 'দুনিয়াপ্রীতি সকল পাপের মূল।'

হাদীসের অন্য বর্ণনায় রয়েছে,

اصل جمیع الخطایا حب الدنیا واصل جمیع الفتن منع العشر والزکوة

'সকল পাপের মূল হচ্ছে দুনিয়ার ভালবাসা এবং সকল ফিৎনার উৎস হচ্ছে উশর ও যাকাত না দেওয়া।' হযরত ইহইয়া বিন মু'য়ায রাযী (রা.) থেকে বর্ণিত যে,

ترک الدنیا کلها اخذ الاخرة کلها فمن ترکها کلها اخذها کلها ومن اخذها کلها ترکها کلها فاخذها فی ترکها وترکها فی اخذها

'দুনিয়া পরিপূর্ণ ছেড়ে দেওয়া মানে আখিরাতকে পূর্ণ আঁকড়ে ধরা। সুতরাং যে পরিপূর্ণভাবে দুনিয়া বর্জন করেছে সে আখিরাতকে সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করেছে। আর যে দুনিয়াকে পুরোদমে গ্রহণ করেছে সে আখিরাতকে পুরোপুরি ত্যাগ করেছে। অতএব, আখিরাত গ্রহণ দুনিয়া বর্জনে এবং দুনিয়া গ্রহণ আখিরাত পরিত্যাগে।

মসনবী

حب دنیا اصل جملہ جرمہاست ✤ منع عشر و منع زکوۃ اصل بلاست
گر تو دار آخرت خواہی جواں ✤ ایں سخن را بشنو از کنجی بجاں
ترک دنیا گو کہ تا از ترک آں ✤ آخرت را حاصل آری اے جواں
ترک دنیا اخذ عقبیٰ باشدت ✤ اخذ عقبیٰ ترک دنیا باشدت
جملہ دنیا کسیکو برگرفت ✤ جملہ عقبیٰ زدست او برفت

দুনিয়াপ্রীতি সকল পাপের মূল, উশর-যাকাত বর্জন বিপদের মূল।

আখিরাত যদি চাও হে যুবকগণ, ইহইয়া রাযীর বাণী মন দিয়ে শোন।
দুনিয়া ছাড়, তা ত্যাগিলে পরে, আখিরাতে লভিবে শান্তি সুখরে।
দুনিয়া বর্জনে আখিরাত গ্রহণ, আখিরাত গ্রহণে দুনিয়া বর্জন।
চতুর্দিকে ঘিরে যদি দুনিয়ার আবেষ্টন, পরকাল হাত ফসকে দূরে করে গমন।

দ্বিতীয়তঃ আউলিয়ায়ে কিরাম 'রাহিমাহুমুল্লাহি' কে নিজের মত অনুমান করা: এ কারণে তারা আউলিয়ায়ে কিরামের ফয়য রহমত বঞ্চিত। পূর্ববর্তী কাফিরগণ আম্বিয়ায়ে ইজাম 'আলাইহিমিচ্ছালাম'কে নিজেদের মত অনুমান করার কারণে চিরস্থায়ী ভ্রষ্টতার কূপে নিপতিত এবং ইসলামের মহান নেয়ামত বঞ্চিত হয়েছে। المرء یقس علی نفسه 'লোক নিজের উপর অনুমান করে' রীতি অনুসারে বলত যে, وما انتم الا بشر مثلنا 'তোমরাতো নও কিন্তু আমাদের মত মানুষ।' (সূরা ইয়াসীন ১৫নং আয়াত সংক্ষেপিত) এবং مالهذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق 'এ রাসূলের কি হলো যে, খাদ্য খায় এবং বাজারে চলা-ফেরা করে।' (সূরা ফুরকান ৭নং আয়াত সংক্ষেপিত)।

মসনবী

تو اپنا سا ست جان کا رفتیر ÷ اگرچہ ہم املا ہیں بس شیر و شیر
وہی شیر ہے جو کہ کہاے آدمی ÷ وہی شیر ہے جو کہ کہاے آدمی
وہی شیر ہے جو ہو در بادیہ ÷ وہی شیر ہے جو ہو در بادیہ
جہاں اسلئے حق سے گمراہ ہوئے ÷ کہ وہ اولیا سے نہ آگاہ ہوے
نہیں دیدۂ بینا کا فر کو تھا ÷ کھچے بد و نیک کو یکسا
نبیوں سے جا ہمسری وہ کئے ÷ ولیوں کو اپنے سے کہنے لگے
کہے ہم بشر اور تم ہیں بشر ÷ ہے دونوں میں آب و خورش کی اثر
وہ ہیں کور باطن نہیں مجھے راز ÷ نہ باہم کئے کچھ بھی امتیاز
ہے دونوں میں فرق از زمین تا فلک ÷ ہیں دونوں جدا مثل دیو و ملک
دو مکھی جو کہاتے ہیں ایک چیز کو ÷ ہے نیش اک سے دیگر سے بس شہد ہو
پئے ہر دو نے پانی اک جاے پر ÷ ہے اک خالی اور دوسرے پر شکر
دوا ہو ہیں کہاتے ہیں گھانس آب کو ÷ ہو لید ایک سے ایک سے مشک ہو
وکھو ایسی ہیں بس ہزاروں مثال ÷ ہے اندر میان فرق ہفتاد سال
یہ کہانے سے ہوتی ہے چرکیں جدا ÷ وہ کہانے سے ہوتا ہے نور خدا
یہ کہانے سے پیدا ہو فحل و حسد ÷ وہ کہانے سے پیدا ہو نور احد
یہ کافور و دوشورۂ خاک ہے ÷ ملک یہ ہے وہ دیو ناپاک ہے
اگر دونوں صورتیں ہیں آکسا ÷ یہ ہے کہار اور وہ میٹا ہے باصفا
وہی جانے جو صاحب ذوق ہے ÷ تلخ اور شیریں میں کیا فرق ہے
حزہ کچھ جو صاحب ذوق ہو ÷ کہ بن چکے دونوں میں کب فرق ہو

سحر پر کہیں معجزہ کی قیاس ÷ کہیں مکر مخفی ہے دونوں کے پاس
وہ سحار و موسیٰ سے لڑنے کو آ ÷ عصا لائے ہر ایک مثل عصا
اگرچہ ہیں اک مثل دونوں عصا ÷ ہے دونوں میں بس فرق بے انتہا
وہ سحار و موسیٰ کے ہیں دو عمل ÷ یہ ہے راست صادق وہ ہیں دغل
اسی عمل پر رحمت اللہ پڑ ہیں ÷ اسی عمل پر لعنۃ اللہ پڑ ہیں
وہ جو ہمسری کیں ہیں بندر مثال ÷ بفرمان حق آئی ان پر وبال
جو کرتے ہیں مردم وہ بندر کریں ÷ بظاہر وہ آدم کا ہمسر بنیں
گماں ان کو ہے ہم بھی کرتے ہیں کام ÷ برابر ہیں ہم اور خیل انام
یہ حکم خدائی سے کرتے ہیں کار ÷ وہ کرتے حسد سے یہی کارزار
موافق منافق نمازیں پڑ ہیں ÷ حقیقت میں دونوں بباطن لڑیں
ہیں دونوں کو حج و زکوٰۃ و صلوٰۃ ÷ ہے بر دو ایک کو دوسرے کو ہے مات
نہیں دونوں کو کبھی یکساں براث ÷ ہے مومن کو بر دو منافق کو مات
اگرچہ ایک ہی کھیل میں غرق ہیں ÷ ولے درمیاں دونوں کے فرق ہیں
جداگانہ ہر شخص کا ہے مقام ÷ کہ ہر ایک کو ان میں ہے ایک نام
مقاموں پہ اپنے چلے ہر کوئی ÷ بھی ناموں پہ اپنے کھیلے ہر کوئی
جو مومن کے شادماں ہوتے ہیں ÷ منافق کے غصہ سے جلتے ہیں
وہ بالذات ہے نام محبوب تر ÷ یہ آفات سے نام معیوب تر
ایا میم و واو میم دونوں پہ ہے ناز ÷ کہ ہو لفظ مومن کا اتنا نیاز
منافق کہے کر کوئی پس یہ نام ÷ تو پچھوسا کاٹے جگر کو مدام
نہیں آیا دوزخ سے گر ہے یہ نام ÷ تو کیوں مثل دوزخ وہ کرتا ہے کام
نہیں زشت یہ نام ہے حرف سے ÷ نہ کہا رہو پانی کہیں ظرف سے
حرف ظرف ہے اس میں معنی ہے آب ÷ تو لے معنی عندہ ام الکتاب
صفا شور و دونوں رواں ایکساں ÷ ہے دونوں میں ہو زخ لا یبغیان
ہیں جاری بہم دونوں اک اصل سے ÷ فرع چھوڑ کر جا تو وہ اصل لے
کھوٹا اور کھرا پن ہو جب آشکار ÷ کہ زر کو گسے محک پر ایک بار
رکھا جس کا حق نے محک جا میں ÷ یقیں اسکو آوے نہ کچھ شک رہیں
دل و جاں سے مقبول ہو جا نثار ÷ براں غوث حق دوست پروردگا
ہوا جان و دل سے جوان پر نثار ÷ وہ پایا ہے دیدار پروردگار
تو اس جا پہ لے تہام اپنا قلم ÷ کہ اب حال غوث خدا رقم

দরবেশের কর্ম নিজের মত করোনা জ্ঞান,
যদিও শির-শের একই রূপ বানান।
শিরতো মানুষে করে যে পান,
শেরতো মানুষ ধরে করে ভক্ষণ।
শির তা, যা থাকে মাদী প্রাণীর স্তনে
শের সে, যে থাকে গভীর বনে।
জগৎবাসী গোমরাহ হলো এ কারণে
চিনলনা যে তারা আল্লাহর আউলিয়াগণে।
সূক্ষ্মজ্যোতি ছিলনা কাফিরদের নয়নে,
পাপী ও পুণ্যবানে তাই সমান জানে।
নিজের মতো জানতো তারা আম্বিয়াগণে,
নিজরূপ বলছে আজি আউলিয়াগণে।
বলে তারা আমরাও মানুষ তোমরাও মানব,
উভয়ের মাঝে রয়েছে মাটি-পানির প্রভাব।
বুঝেনা রহস্য অন্তর্দৃষ্টিহীন অন্ধজনে,
বুঝিতে চায়না ব্যবধান দু'য়ের মাঝখানে।
দু'য়ের মাঝে আকাশ-পাতাল ব্যবধান,
ঠিক দেব ও দানবের পার্থক্য যেমন।
দু'ধরনের মাছি খায় একই ফুলের রস,
একটিতে মধু হয় অপরটিতে বিষ।
একই ঘাটে পানি পান করে দুই জন,
একটি শূন্য অপরটি মিষ্টি রসে পূর্ণ।
ঘাস ও পানি খায় দুই হরিণে
একটি বিষ্টা, অন্যটি পূর্ণ মৃগ সুঘ্রাণে।
এরূপ দেখিবে হাজার হাজার উদাহরণ,
দু'য়ের মাঝে সত্তর বছরের ব্যবধান।
কেউ খেলে বাড়ে তার গু-গোবর,
কারো অন্তরে বাড়ে নূর যে আল্লাহর।
কেউ খেলে জন্মে হিংসা-কৃপণতা অফুরন্ত
আল্লাহর জ্যোতি হয় কারো সব আলোকিত।
এটি সুগন্ধিত কর্পূর অপরটি মাটির ক্ষার,
এতো ফিরিস্তা সুন্দর সে দানব ছার।
দেখতে যদিও দু'টি এক রকমের দেখায়,
একটি তিক্ত বিষ অপরটি মিষ্ট মধুময়।
স্বাদাস্বাদন ক্ষমতাধর ব্যক্তিই বুঝে,
কী পার্থক্য মিষ্ট ও তিক্তের মাঝে।
স্বাদাস্বাদন ক্ষমতা থাকলেই বুঝে সে মজা,
না খেয়ে কিরূপে বুঝিবে সে মজা?
মু'জিযায় করল অনুমান যাদুর পরে
পার্থক্য প্রমাণিত হলো তাই অমনি করে।

যাদুকর এল হযরত মূসার সনে লড়তে,
লাঠির মতো লাঠি নিয়ে আপন হস্তে।
যদিও লঠির মতো লাঠি দু'টি দেখিতে
অনন্ত ব্যবধান কিন্তু এ দু'য়েতে।
সূসা ও যাদুকরের কর্ম ভিন্ন ভিন্ন
একটি পূর্ণসত্য অন্যটি প্রতারণাপূর্ণ।
একটি পরে আল্লাহর দয়া হয় বর্ষিত,
অন্যের কাজে আল্লাহর অভিশাপ হয় অবতারিত।
বাঁদররূপ লোকেরা সমকক্ষতার দাবীদার,
আল্লাহর নির্দেশে এল গজব তাদের উপর।
সমকক্ষতার দাবী করে কেবল বাঁদরে,
আদম রূপ হয় তারা শুধু জাহেরে।
ধারণা তাদের আমরাও করি কাজ
সমান হই আমরা ও সৃষ্টিরাজ।
এঁরা আল্লাহর মর্জিতে করেন সবকাজ
তারা করে হিংসা-বিদ্বেষে যত কুকাজ।
মুনাফিক রূপে পড়ে তারা সালাত,
গোপনে লড়ে মু'মিনের সাথ।
উভয়ে করে পালন হজ্ব, যাকাত ও সালাত,
একে আশীর্বাদ অন্যের তরে অভিসম্পাত।
এক বরাবর নয় দুইয়ের বরাত,
মু'মিনে পুরস্কার কাফিরের তরে নিপাত।
একই কাজে যদিও উভয়ই মত্ত,
কিন্তু দু'য়ের মাঝে মস্তবড় পার্থক্য।
প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন মকাম
রয়েছে সকলের পৃথক পৃথক নাম।
আপন স্তরে প্রত্যেকে পরিচালিত,
আপন আপন নামে সকলে পরিচিত।
মু'মিন বললে উৎফুল্ল হয় সকলে,
মুনাফিক ডাকলে রাগে সদা জ্বলে।
মু'মিন নামটি সত্যিই অতি প্রিয়তর,
নানা দোষে দোষী মুনাফিক ইতর।
মিম ওয়া মিম নূন পরে সবার নায,
মু'মিন শব্দে হয় যে এত নিয়ায।
মুনাফিক কহে যদি কেউ এনাম,
বিচ্ছু সদৃশ হৃদে করে আক্রমণ।
দোযখ থেকে না আসলে এনাম,
তবে কেন দোযখীবৎ করে কাম।
এ নাম বর্ণ হেতু নহে কদাকার,
পাত্র কারণে পানি হয়না ক্ষার।
বর্ণ পাত্রবৎ অর্থ যেন পানি,
তাঁর হাতে উম্মুল কিতাব মর্মচান তিনি।
লোনা-মিষ্টি দু'টি চলে এক সাথে,
দু'য়ের মাঝে বরযখ না পারে মিশতে।
একই মূল হতে দু'টি উৎসরিত,
শাখে নয় মূলে পৌঁছে হও মিলিত।
কৃত্রিম আর খাঁটি হবে যে নির্ণিত,
কষ্টি পাথরে স্বর্ণে করলে ঘর্ষিত।
যার অন্তরে দিলেন আল্লাহ কষ্টি পাথর,
সন্দেহমুক্ত বিশ্বাসে পূর্ণ তার অন্তর।
মনোপ্রাণে মকবূল হয়ে যাও উৎসর্গিত,
গাউসে হক্ব পরে যিনি পরওয়ার দোস্ত।
মনোপ্রাণে হয় যে উৎসর্গতার পরে,
নিশ্চয় পাবে সে আল্লাহ্ পরওয়ার দেগারে।
কলমের লাগাম এবে কষে ধর,
গাউসে খোদার হাল কিছু বয়ান কর।

গযল

موسم بہار کا ہے کیسا ترک مے کروں ✿ پیکر شراب عشق کو جنجال ملی کروں
مطرب کہاں ہے اب علوم زہد و تقوی کو ✿ فدائے بانگ بربط و آواز نی کروں
زاہد کا زہد و علم سے اب دل مرا ہے تنگ ✿ اب جان دل سے خدمت معشوق دی کروں
اب میر مغاں دل سے ہوتا ہیں مرید ✿ پیکر شراب عشق کو ہوا در ہے کروں
کلمہ پڑھ ہوتا ہیں مغاں کی اور میں ✿ باقی عمر میخواروں کا ہمراہ ملی کروں
اکجام بھر دے ساقیا مستی فزائے عشق ✿ تا میں حکایت جم و کاؤس دی کروں
غوث خدا مقبول بیدل پر نظر ہو اب ✿ تا ایکبار بخت کو فرخندہ پے کروں

মৌসুম বসন্তের শরাব ছাড়া রই কেমনে,
প্রেমসুরা পানে জঞ্জাল লংঘন করবো।
চারণকবি কই, ইলম তাকওয়া যুহদ এবে,
বাঁশী আর গানের সুরে উৎসর্গ করবো।
হৃদে নাহি লয় যুহদ আর ইলম কিছুই
মনোপ্রাণে কেবল শরাব ও মাশূকের সেবা করবো।
হৃদয়শরাবখানার আমীর হস্তে হবো মুরীদ
প্রেমশরাব পিয়ে সদা হা-হুতাশ করবো।
পড়ে কলেমা শরাবখানার মহান মুর্শীদের
বাকী জীবন শরাবী সনে মিশে কাটাবো।
প্রেমমত্ততা বর্ধক এক পেয়ালা দাও পুরে সাকী,
তবে রাজসিংহাসনের হেকায়ত সদা করবো।
হে গাউসে খোদা কর দৃষ্টি বেদিল মকবূলে,
ভাগ্য তবে একবার চিরসুখী যে করবো। (চলবে)

সূফী তত্ত্ব ও সূফী সাধনায় ফানা ও বাকা

● মোহাম্মদ জাফর উল্লাহ ●

সূফিতত্ত্ব তাসাউফের বাংলা রূপ। আরবী শব্দ তাসাউফ সাওফ থেকে নির্গত। এর অর্থ পশম। আর সূফি মানে যে পশমী কাপড় পরিধান কেরন। সূফিগণ মোটা পশমী কাপড় পরিধান করতেন বলে তাদের সূফি বলা হয়।[১] সূফিবাদ বা তাসাউফের ইতিহাস ইসলাম ধর্মের মতই পুরাতন। ইসলামের সূচনা লগ্ন থেকেই সূফিবাদের বিকাশ ঘটে। তাসাউফ ইসলামের রূহ বা আত্মা। আর শরীয়ত হল এর দেহ বিশেষ। সকল নবী রাসূল স্বীয় আত্মাকে পরিশোধিত করার জন্য একনিষ্ঠ ছিলেন।

তাঁরা ধ্যান মগ্ন থাকতে পছন্দ করতেন। এ কারণে বলা যায় সূফি সাধকের তত্ত্বের সূচনা আদি পিতা হযরত আদম (আ.) থেকে সূচিত হয়েছে। অবশ্য সূফি নাম হিজরী দ্বিতীয় শতকের পূর্বে সাধারণ মানুষের মধ্যে পরিচিত না হলেও সূফি চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তিবর্গের পরিচয় এর বহুপূর্বেই পাওয়া যায়।

আল্লামা কুশাইরী তার আররিসালাহ গ্রন্থে বলেন- মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ছিলেন প্রথম সূফি এবং তাঁর সাহাবীরা ও তাবেঈগণ ছিলেন এ তত্ত্বের অনুসারী। তবে তাঁরা সূফি অভিধা গ্রহণ না করে সাহাবী ও তাবেঈ উপাধি বেশি উপভোগ করতেন। এ প্রসঙ্গে হযরত আলী হাজভেরী তাঁর কাশফুল মাহজুব গ্রন্থে হযরত আবুল হাসান থেকে বর্ণনা করেন- বর্তমানে তাসাউফ সারতত্ত্ববিহীন একটি নাম সর্বস্ব বিষয়। কিন্তু বিগত দিনে এটি ছিল পরিচয় বিহীন একটি বাস্তব বিষয়। আল্লামা হাজভেরী আরও বলেন- সাহাবী ও তাবেঈদের যুগে এ নামের অস্তিত্ব ছিল না অথচ এর সারতত্ত্ব প্রত্যেকের কাছে ছিল দেদীপ্যমান।

হযরত আলী (রা.) হতে তিন ধারায় সূফি তত্ত্বের বিকাশ লাভ করেছে। **এক.** যারা তাঁর হাতে বায়াত গ্রহণ করেছেন। **দুই.** তাঁর পুত্র ইমাম হাসান ও হোসাইন (রা.)এর বংশানুক্রমে। **তিন.** তাঁর অন্যান্য পুত্রদের বংশধারায়। ইমাম হোসাইন (রা.) এর পুত্র ইমাম জয়নুল আবেদীন (রহ.) এর আটজন পুত্র সন্তান ছিল। বিশেষত তাঁদের মাধ্যমে পরবর্তীতে তাসাউফের বিকাশ লাভ করে।

খ্রিষ্টীয় নবম ও দশম শতাব্দীতে তাসাউফের চরম উন্নতি সাধিত হয়। হযরত ফুদাইল ইবনে আয়ায(রহ.) এর প্রধান খলিফা হযরত মারুফ কারখি(রহ.) (৮০৮খৃ.) এবং তার শিষ্য হযরত সিররি সাকতি (রহ.) (৮৫৭খৃ.) তাসাউফের প্রচারক ছিলেন। এ শতাব্দীতে আল মুহাসিবি (রহ.) (৮৩০খৃ.) প্রথম সূফি তত্ত্বের উপর কিতাব রচনা করেন। হযরত জুনাইদ বাগদাদী(রহ.) তার শিষ্য ছিলেন। এর পর জুন্নুন মিসরী(রহ.) যিনি সূফি দর্শনকে আরও শাণিত করেন। এসময় কতিপয় সূফি এমন কিছু গুপ্ত রহস্য বর্ণনা করেন যা প্রথমে মুসলিম সামাজকে সাংঘাতিকভাবে আলোড়িত করেছিল। এদের পুরোধা হলেন হযরত বায়েজিদ বোস্তামী(রহ.) (৮৭৪খৃ.) তার 'হামে উস্ত' তত্ত্বদ্বারা তিনি সর্বেশ্বরবাদের গোড়া পত্তন করেন। তিনিই প্রথম ফানাবাদের প্রবর্তন করেন।

দশম শতাব্দীর প্রথম দিকে প্রখ্যাত সূফি সাধক জুনায়েদ বোগদাদী(রহ.) (৯১০খৃ.) হযরত বায়েজিদের ফানাতত্ত্ব স্বীকার করে তাঁর বাকাতত্ত্ব প্রচার করেন। এসময় তার শিষ্য মানসুর হাল্লাজের (রহ.) 'আনাল হক' তত্ত্ব উপলব্ধি করতে না পেরে জাহেরী আলেমরা তাকে কাজির বিচারের কাঠগড়ায় উপস্থাপিত করেন।

হাল্লাজের (রহ.) যুক্তিটি এরূপ- একজন সূফি যখন আল্লাহর সাথে একাত্ম হন তখন তার এবং আল্লাহ্র মধ্যে কোন ফাঁক থাকে না। আর তা থাকে না বলেই এ একাত্ম অবস্থায় সূফির কোন পৃথক সত্ত্বা বা বক্তব্য থাকে না। বরং স্বয়ং আল্লাহ তার মুখ দিয়ে কথা বলেন। অর্থাৎ, সূফি অভিজ্ঞতার চরম মুহূর্তে সূফি একজন ব্যক্তি হিসেবে তার নিজেকে আল্লাহ্ বলে হাজির করেন না; বরং আল্লাহই সে সূফিকে তাঁর বাহন হিসেবে ব্যবহার করেন। হাল্লাজের এ বক্তব্যের প্রতিধ্বনি শুনা যায় হযরত জুনাইদ বোগদাদীর(রহ.) কণ্ঠে-তিনি বলেন, ত্রিশ বছর ব্যাপী আল্লাহ মানুষের জবানে জুনাইদের ভেতর দিয়ে লোক সমাজে কথা বলেন, আর জুনাইদ তখন কথা বলেননি। কিন্তু সমাজ তা বুঝতে পারেনি।

এরপর সূফি দর্শনের বিকাশ হতে থাকে। কিন্তু খ্রিষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে সূফিদের উপর এক চরম বিপর্যয় নেমে আসে। কেবল শরীয়তপন্থী আলেমরা সূফি দর্শনকে ইসলামের পরিপন্থী বলে ঘোষণা করে। এ আন্দোলনে তারা তখনকার শাসকগোষ্টিকে দিয়ে সূফিদের উপর চরম অত্যাচার চালান। সূফিদের এমন যুগসন্ধিক্ষণে আবির্ভূত হন হুযযাতুল ইসলাম ইমাম গাযালী (১০৫০-১১১১ খৃ.)। তিনি শরিয়তের সাথে সূফি দর্শনের সমন্বয় সাধন করে প্রায় চারশত কিতাব রচনা করেন। তিনি শরিয়ত মারিফাতের বিরোধ নিরিসন করে ইসলামী দর্শনের পূর্ণতা সাধন করেন। এরপর শ্রেষ্ঠ তাপস অলৌকিক ক্ষমতা সম্পন্ন সূফি সাধক হযরত আব্দুল কাদের জিলানী(১০৭৭-১১৬৭খৃ.) রাহমাতুল্লাহ আলাইহির আবির্ভাব

হয়। তিনি কাদেরীয়া তরিকা প্রবর্তন করেন। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে সূফি দর্শনের পূর্ণতা সাধন করেন জগতবিখ্যাত অলি খাজা মুঈনুদ্দিন চিশ্‌তী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি (মৃত.১২৩৫খৃ.)। এ শতাব্দীতে বিখ্যাত অলি হযরত শিহাবউদ্দিন সোহরাওয়ার্দী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি (মৃত.১২৩৩খৃ.) ভারতে কাদেরীয়া তারীকার শাখা সোহরাওয়ার্দীয়া তরিকার প্রবর্তন করেন। এ শতাব্দীতে স্পেনীয় সূফি দার্শনিক হযরত মুহিউদ্দিন আরবী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি (মৃ.১২৪৩খৃ.) সূফি দর্শনকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেন। বিশ্ববিখ্যাত সূফি সাধক জালালউদ্দিন রুমী রাহমাতুল্লাহ আলাইহিও (মৃ.১২৭৩খৃ.) এ শতাব্দীতে আবির্ভূত হন। তিনি মৌলভিয়া নামে একটি সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করেন। এরা ধর্ম নৃত্য ও ধর্ম সংগীতের একান্ত ভক্ত।

পরবর্তীতে সকল সূফি সাধক উল্লিখিত সূফিদের অনুসরণ করেন।

সূফী দর্শনের লক্ষ্য ও মূলনীতি:

সূফী দর্শনের মূল লক্ষ্য আল্লাহর সান্নিধ্যে থেকে তাঁর দীদার লাভ করা। পরম প্রেমময়ের সাথে মিলনই সূফী সাধনার মূল কথা। মাশুকের সাথে মিলনের এই চরম পরিতৃপ্তি বস্তুজগতের কোন কিছুই দিতে পারে না। তাই জড়-জগতের ক্ষণস্থায়ী সুখ ও সম্পদের প্রতি সূফী সাধকের এক বিরাট উদাসীনতা, এক দারুণ অনীহা, ক্ষণস্থায়ী পার্থিব প্রলোভন ও ইন্দ্রিয়াশক্তি থেকে মুক্ত হয়ে পরিপূর্ণ মনুষত্ত্বের সাধনায় তারা নিয়োজিত হন। পার্থিব আসক্তি দূর হলে আধ্যাত্মিক প্রেম এসে সেই শূন্যস্থান পূরণ গায়ের আল্লাহ দূর হলে স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা এসে তার সিংহাসনে বসেন। এই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করে ইনসান-ই-কামিল (পূর্ণ মানব) হতে হলে সুফীদের কতকগুলো মৌলিক নীতি অনুসরণ করে চলতে হয়।

তওবা (অনুতাপ), তাওয়াক্কুল (নির্ভরতা), তাকওয়া (পরিবর্জন), সবর (ধৈর্য্য), ইখলাস (পবিত্রতা), শোকর (কৃতজ্ঞতা), রেজা (আত্মতুষ্টি), যুহদ (বৈরাগ্য), খওফ (আল্লাহ ভীতি), ফকর (দারিদ্র্য), আদব (ভাল ব্যবহার), মহব্বত (আল্লাহ প্রেম), মোরাকেবা (ধ্যান), তাওহীদ (একত্ব), ইলম (আধ্যাত্মিক জ্ঞান) প্রভৃতি সূফী তরীকার প্রাথমিক নীতি সূফী জীবনে এগুলো প্রতিফলিত না করা পর্যন্ত মারিফাত ও হাকীকত লাভ হতে পারে না এগুলো লাভ করা বা এই নীতিমালা অনুসরণ করা তরীকতপন্থীদের অবশ্য কর্তব্য।

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ৭টি মূলনীতি সূফী সাধককে অনুসরণ করে চলতে হয় - আত্মসমর্পণ, যিকির (স্মরণ), কাশফ (অতিন্দ্রিয় অনুভূতি), সামা (আল্লাহ্ প্রেমমূলক সঙ্গীত), হাল (ভাব বা অবস্থা), ফানা (আত্মবিলয়) ও বাকা (আল্লাহতে স্থিতি লাভ)।

(ক) আত্মসমর্পন: আল্লাহতে পরিপূর্ণ সমর্পনই ইসলামের মর্মকথা। মুসলিম জীবনের ইহকাল ও পরকালের সবকিছু আল্লাহরই জন্য সমর্পিত। সেজন্য পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেন, '(বল), আমার উপাসনা আরাধনা, উৎসর্গ অনুষ্ঠান, আমার জীবন মরণ সমস্তই বিশ্বনিয়ন্তা আল্লাহরই জন্য।' সূফীরা এই শাশ্বত বাণীর অনুসরণেই আত্মসমর্পনের বিশেষ নীতি মেনে চলেন। তারা আধ্যাত্মিক পথপরিক্রমার প্রারম্ভেই মুরশিদ বা পীরের নিকট আত্মসমর্পন করেন। শিক্ষকের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ও আনুগত্য প্রাকাশ ব্যতীত যেমন কোন ছাত্রের শিক্ষা গ্রহণ সার্থক হতে পারে না, তেমনি সূফী সাধকের পক্ষেও স্বীয় পীর মুরশিদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও পরিপূর্ণ অনুগত না হওয়া পর্যন্ত মারিফাত অর্জন সম্ভব নয়। এ সময় পীরের নিকট মুরিদ দুভাগে আত্মসমর্পণের ক্রিয়া সমাধা করেন।

প্রথমতঃ নিজের আখলাক ও নিজের ইচ্ছাকে ত্যাগ করে পীরের আখলাক ও ইচ্ছা গ্রহণ করন। পীর নায়েবে নবী। রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয় সাল্লামা এর সবগুণ পীরের কাছেই বর্তমমান। তাই তার আখলাক গ্রহণ করা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয় সাল্লামা এর আখলাকই গ্রহণ করার নামান্তর। দ্বিতয়িতঃ তাসাওরে শায়েখ বা পীরের সুরাত (চেহারা)ধ্যান। এখানে পীরের চেহারা এমনিভাবে ধ্যান করতে হয়, যেন মুরদিদের নিজস্ব কোন চেহারাই নেই। তাসাওরে শায়েখকে কোন কোন তরীকার বরযাখ (আড়াল) বলা হয়। পীরের চেহারা ধ্যান করার সাধনে নূরই মুহাম্মদী লাভ হয় এবং নুর-ই-মুহাম্মদী ধ্যান করার মধ্য দিয়ে নুর-ই-তাজাল্লী লাভ হয়। এমনিভাবে সাধক পীরের কাছে আনুগত্য ও আত্মসমর্পনের মাধ্যমে আল্লাহর প্রতি আনুগত্য ও আত্মসর্মণের শিক্ষা গ্রহণ করেন। সাধারণ উচ্চমর্গে সূফী নিজের ইচ্ছাকে আল্লাহর ইচ্ছার মধ্যে বিলীন করে দেন। এভাবে পরিপূর্ণ আত্মসর্মপণের মাধ্যমে সূফী সাধক আল্লাহর রহমত ও নিয়ামত লাভ করার সৌভাগ্য অর্জন করেন।

(খ) যিকিরঃ আল্লাহ স্মরণকে যিকির বলে। সাধারণত আল্লাহর কোন নাম বা কুরআনের কোন আয়াত পুণঃ পুণঃ আবৃত্তি করার নাম যিকির। কুরআনে বলা হয়েছে, "ফাযকুরুনী আযকুরুকুম" অর্থাৎ তুমি আমাকে স্মরণ কর, আমিও তোমাকে স্মরণ করব। অন্যত্র, "হে বিশ্ববাসিগণ! যত বেশী সম্ভব আল্লাহর যিকির কর, আর সকালে ও সন্ধ্যায় তাঁর মহিমা কীর্তন কর।' কুরআন ও হাদীসে যিকির করার উপর বহু আয়াতে জোর দেয়া হয়েছে। যিকির সাধারণতঃ দু প্রকারঃ যিকরে জলী বা উচ্চস্বরে আল্লাহর

নাম আবৃত্তি এবং যিকরে খফী বা নীরবে আল্লাহর নাম আবৃত্তি। যিকরে খফীর মর্তবা বেশী। সূফী যাকের (স্মরণকারী)-কে আল্লাহর মধ্যে লীন হতে চার প্রকার যিকিরের মাধ্যমে অগ্রসর হতে হয়। যথাঃ-

(১) যিকরে লিসানী অর্থাৎ মুখ ও জিহ্বার দ্বারা আল্লাহর বিশেষ নাম উচ্চারণ বা আয়াত বারবার আবৃত্তি করা। কুরআন পাঠ, হাদীস ও দীন সম্পর্কে আলোচনা এবং আল্লাহ ও রসুল সম্পর্কিত কবিতা ও গযল পাঠ যিকরে লিসানীর অন্তর্গত।

(২)যিকরে কালবী অর্থাৎ কলব (হৃদয়ের) এর দ্বারা আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা । এতে কলব এর আবর্জনা দুরীভূত হয়ে কলব আয়নার ন্যায় পরিষ্কার হয়। নুর-ই-তাজাল্লী কলব এর আবর্জনা দুরীভূত হয়ে কলব আয়নার ন্যায় পরিষ্কার হয়। নুর-ই-তাজাল্লী কলব এর উপর প্রতিফলিত হয়ে যাকেরর আধ্যাত্মিক চোখে তা পরিদৃশ্যমান হয়ে উঠে।

(৩) যিকরে আনফাসী বা শ্বাস-প্রশ্বাসের যিকির। এই যিকিরের মর্তবা খুব বেশী । শ্বাস-প্রশ্বাসের দ্বারা আল্লাহর নাম উচ্চারণ করাই এই যিকিরের নিয়ম। খেয়ালের মোকামের সাথে যিকরে আনফাসীর যোগসূত্র রয়েছে। এই যিকিরের দ্বারা সুফীরা সর্বদা আল্লাহর নাম স্মরণ করেন।

(৪) যিকরে আয়নী বা চোখের যিকির। যিকিরকারীর এটাই হচ্ছে চরমতম ও উচ্চতম মার্গের যিকির। নুর-ই-তাজাল্লীকে দর্শনই এই যিকিরের মূল উদ্দেশ্য। কুরআনে এই যিকির সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন, "ফাআয়নামাতুয়াল্লু ফাসাল্লা ওয়াজহুল্লাহ।" অর্থাৎ 'তুমি যেদিকেই তাকাও, আল্লাহর মুখ সেদিকেই বর্তমান। সব সময় আল্লাহকে আধ্যাত্মিক চোখে স্মরণ করাই এই যিকিরের কাজ। এই যিকিরের মোকাম উত্তীর্ণকারী সুফী আল্লাহর প্রথম শ্রেণীর আওলিয়া শ্রেণীভুক্ত।

"লা ইলাহা ইল্লাহ্ "ও "আল্লাহ" এ দুইটি সাধারণতঃ যিকিরের মাধ্যমে বারবার আবৃত্তি করা হয়।

স্বীয় সত্ত্বা বিস্মৃতি হয়ে আল্লাহতে ফানা হয়ে তাঁর মিলন সুধা পান করাই যিকিরের মূল উদ্দেশ্য।

(গ)কাশফ বা অতিন্দ্রিয় অনুভূতিঃ সূফী দর্শন অনুযায়ী কাশফ বা সজ্ঞা অতীন্দ্রিয় অনুভূতির মাধমেই সাধক আল্লাহকে জানতে পারেন। কাশফ এমন এক ধরনের অন্তর্দৃষ্টি, যার সাহায্যে সাধক ভূত ভবিষ্যত জগতের দৃশ্য, অদৃশ্য, আত্মা, আল্লাহর যাত ও সিফাতকে জানতে প্রয়াস পান। পীর-ই-কামিলের ফয়েজ (জ্ঞানালোক) ও তাওয়াজ্জুহ (বুকের সাথে বুকের স্পর্শজনিত নৈকট্য প্রাপ্তির অবস্থা) কাশফ বা অন্তর্দৃষ্টি লাভের অপরিহার্য প্রাথমিক অবস্থা।

কাশফ দুইপ্রাকরঃ যথা- কাশফে কাওনী ও কাশফে ইলাহি

ভবিষ্যত কালের বা দূরবর্তী স্থানের দৃশ্য বা অদৃশ্য বিষয়সমূহের জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়াকে কাশফে কওনী বলে। সলুক বা শিক্ষা নির্দেশনা সম্পর্কে, যাত ও সিফাত সম্পর্কে ইলম এবং মারিফাতের কোন সুক্ষ্ম বিষয়

অন্তঃকরণের মধ্যে আল্লাহর তরফ থেকে নিক্ষিপ্ত হওয়া বা আধ্যাত্মিক জগতের কোন জ্ঞান আল্লাহর তরফ হতে প্রাপ্ত হওয়াকে কাশফে ইলাহী বলে।

প্রজ্ঞা ও ইন্দ্রিয়ানুভূতি সূফীকে আল্লাহ সম্পর্কে কোন বাস্তব জ্ঞান দিতে পারে না। শুধু কাশফই সূফীকে আল্লাহর বাস্তব জ্ঞান দিতে সক্ষম। সূফী যখন আপন নশ্বর অস্তিত্ব বিলোপ করে ফানাফিল্লাহর গভীর তন্ময়তার মধ্যে বিদ্যমান হন, তখন তার অসীম অস্তিত্বের জ্ঞান অতীন্দ্রিয় অনুভূতি হিসাবে দিল দরিয়ায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠে। সাধনার উচ্চমার্গে সূফী কিছুক্ষণের জন্য আল্লাহর অসীমতার মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলেন, হারিয়ে ফেলেন জাগতিক সর্বপ্রকার জ্ঞান ও অনুভূতিকে; নিজেতে বিস্মৃত হন অসীমতার নিবিড় প্রেম স্পর্শে পিয়ে এবং এই মুহূর্তেই সূফী আধ্যাত্মিক অস্তিত্বের জ্ঞান লাভ করেন। সূফীদের নিকট কাশ্ফলব্ধ জ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান।

(ঘ) সামাঃ আল্লাহ প্রেমমূলক সঙ্গীতকে সামা বলে অবিহিত করা হয়। হামদ (আল্লাহর স্তুতি) , না'ত [হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয় সাল্লামা এর প্রশস্তি] গযল (আল্লাহ প্রেমমূলক গান), মুরশিদী (পীর ও মুর্শিদ সম্পর্কিত সঙ্গীত), মারিফাতী (তত্ত্বমূলক গান), কাওয়ালী (হাম্দ না'ত, গযল, মুরশিদী প্রভৃতির রাগ ও ভাবপ্রধান সঙ্গীত), আধ্যাত্মিক সঙ্গীত, দেশ প্রেমমূলক সঙ্গীত প্রভৃতিকে সামা বা বিশুদ্ধ সঙ্গীতের পর্যায়ভুক্ত করা হয়ে থাকে। হযরত গাযালী (রা.) সঙ্গীতকে ৩ ভাগে ভাগ করেছেন; যথাঃ- ১.মুবাহ্ ২.সদ্ভাব বর্ধক ও ৩.হারাম। উপরে বর্ণিত সামাসমূহ শ্রবণ করা মুবাহ ও সদ্ভাব বর্ধক পর্যায়ের অন্তর্গত । যে গান বাজনায় অশ্লীলতা আছে, যৌন উদ্দীপক এবং মানুষকে ব্যভিচারে লিপ্ত করে তা সম্পূর্ণ হারাম ও পরিত্যাজ্য। সুফিদের মধ্যে সবাই সঙ্গতি প্রিয় নন। আধ্যাত্মিক সঙ্গীত বা সামার দ্বারা অন্তরে আধ্যাত্মিক অনুভূতিকে জাগিয়ে এবং আল্লাহর ধ্যানে নিবিষ্ট করাই এই সঙ্গীতের আসল কাজ। কোন কোন সূফী সাধক এই সঙ্গীতকে 'রুহানী গেযা' বা আত্মার আহার্য বলে মনে করেন। প্রকৃতপক্ষে, সামা এর শ্রবণকারীকে আধ্যাত্মিক রাজ্যে টেনে নিয়ে যায় এবং মুহূর্তে সাধকের মনে আধ্যাত্মিক ভাব জাগিয়ে তোলে। সামা প্রকৃত শ্রবণকারীকে 'জজবার' (ভাবনোদনা) পর্যায়ে নিয়ে যায়। সাধারণতঃ চিশতীয়া ও মৌলবীয়া তরীকার সুফিগণ সামা শ্রবণ করে থাকেন। (চলবে)

আধ্যাত্মিক পথ ও পাথেয়

● অধ্যক্ষ আলহাজ্ব মাওলানা গোলাম মুহাম্মদ খান সিরাজী ●

বেলায়ত, সূফিতত্ত্ব ও আধ্যাত্মিকতা সম্বলিত ইতিহাস ভিত্তিক গ্রন্থ "ছিয়ারুল আউলিয়া" যা ১৩০২ ইংরেজী সন থেকে ১৩২০ ইংরেজী সন পর্যন্ত সময়কালের মধ্যে বিরচিত। কিতাবটি রচনার সূত্রপাত করেন–শায়খুশ শুয়ূখিল আলম, সুলতানুল মশায়েখ, মাহবুবে ইলাহী, হযরত খাজা নিজাম উদ্দীন আউলিয়া কুদ্দাসাল্লাহু সিররাহুল আজিজ। পরবর্তীতে তার পূর্ণাঙ্গতা প্রদান করেন তাঁরই মুরিদ পরিবারের সদস্য বিখ্যাত আধ্যাত্মিক মণীষী হযরত আল্লামা সৈয়দ মুহাম্মদ মুবারক মুহাম্মদ উলুবী আল কিরমানী (রহঃ) যিনি "আমীরে খুরদ" নামে সমধিক পরিচিত। মূল ফার্সী ভাষায় রচিত এ অমূল্য গ্রন্থখানা অন্যান্য ভাষাতেও অনূদিত হয়েছে। এ গ্রন্থে মাহবুবে ইলাহী খাজা নিজাম উদ্দীন (কঃ)-এর সাথে সংশ্লিষ্ট বিবিধ বিষয়ের ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর বিবরণ ও বিবৃতি প্রাধান্য পেয়েছে। এছাড়া চিশ্‌তিয়া পরিবারের অপরাপর মণীষীদের সম্পর্কে তথ্যাদিও সন্নিবেশিত হয়েছে। ৫৫০ পৃষ্ঠা কলেবরের উক্ত গ্রন্থ থেকে গুরুত্বপূর্ণ অংশবিশেষ বাংলা ভাষান্তর ও ভাব সম্প্রসারণ করতঃ বিশিষ্ট লিখক ও মাইজভাণ্ডারী গবেষক অধ্যক্ষ আলহাজ্ব মাওলানা গোলাম মুহাম্মদ খান সিরাজী উপর্যুক্ত শিরোনামে পর্বে পর্বে প্রকাশের প্রয়াস নিয়েছেন। ক্ষেত্রবিশেষে অনূদিত অংশের পৃষ্ঠা নং উল্লেখ করা হয়েছে।

হযরত সুলতানুল মাশায়েখ কাদ্দাসাল্লাহু সিরুরাহুল আজীজ ইরশাদ করেছেন যে, এক ব্যক্তি জনাব সরওয়ারে কায়েনাত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট জিজ্ঞাসা করল যে, আমার পিতার অবস্থা কী? (অর্থাৎ পরজগতে তিনি কোন অবস্থায় রয়েছেন তা জানতে প্রশ্ন করলেন- সিরাজী)। রাসূলে পাক (সাঃ) উত্তরে ইরশাদ করলেন যে, সে দোযখের আগুনের মধ্যে রয়েছে। এ কথা শুনে ঐ ব্যক্তি চিন্তিত হয়ে পড়লো। রাসূলের নিকট থেকে সে ফিরে যেতে লাগল। এমতাবস্থায় রাসূলে পাক (সঃ) তাকে ডেকে এনে বললেন- আমার এবং তোমার পিতা উভয়ে আগুনে রয়েছে। এ কথা শুনে ঐ লোকটির অন্তরে শান্তনা হলো। (অর্থাৎ- যেহেতু লোকটির পিতার পরকালীন অবস্থা অদৃশ্য জগতের সংবাদ জ্ঞাত, আলেম মা কান মা ইয়াকুন নবী করিম (সাঃ) তাঁর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম দৃষ্টিশক্তি দ্বারা দেখছিলেন, তাই ঐ লোকটিকে নবী করিম (দঃ) আপনা পিতার জন্য দৃশ্যতঃ একই ধরণের মন্তব্য করে ঐ লোকটিকে শান্তনা প্রদান করেছিলেন। কারণ নবীর নিকট থেকে কেউ নিরাশ হয়ে ফিরে যান না। বস্তুতঃ ঐ লোকটির পিতা দোযখি হলেও নবী করিমের পিতাকে আগুনে রয়েছে মর্মে উক্তি করার অর্থ হলো তিনি আল্লাহ্ ও নবীর প্রেমের আগুনে জ্বলছিলেন। সর্বশ্রেষ্ঠ মহানবীর পিতা হয়েও নবীকে তাঁর বিকাশকালে দেখা পাওয়ার সৌভাগ্য না হওয়াতে তিনি নবী প্রেমে জ্বলছেন। আর তিনি ছিলেন মুমিন ও একত্ববাদী, কুফরী-শিরকের কোন ছোঁয়াও তাঁর ঈমান আকীদার মধ্যে স্পর্শ করতে পারেনি, সুতরাং তিনি আগুনে আছেন অর্থ কস্মিনকালেও দোযখ বুঝাতে পারে না। আগুন শব্দটা যদিও উভয়ের ক্ষেত্রে দুটি ভিন্ন রূপ ছিল। উপরোক্ত কালামে নবী থেকে কেউ যেন ভুল ব্যাখ্যা নেয়ার চেষ্টা না করে সে দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে কেন না অপব্যাখ্যা করার ফলেই বহুধা বাতিল ফিরকার উদ্ভব হয়েছে, এ জাতীয় বর্ণনাগুলোতে খুবই সতর্কতা অবলম্বন করতে হয় প্রকৃতপক্ষে উক্ত বাণীটি ছিলো লতীফ বা সূক্ষ্ম কথার অন্তর্ভূক্ত - সিরাজী।)

আরেকটি সূক্ষ্ম কথাঃ

হযরত সুলতানুল মাশায়েখ (কঃ) ইরশাদ করেন যে, এক সময় হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাদ্বিঃ), আমীরুল মুমেনীন হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু তাঁদের সাথে আরো একজন সাহাবী এ তিনজন কোথাও যাচ্ছিলেন। হযরত আলী (কঃ) মাঝখানে ছিলেন। অপর দুইজন ছিলেন তাঁর দুপাশে। যেহেতু মওলা আলী (কঃ)-এর দেহ মুবারক ঐ দুজনের তুলনায় ছোট ছিল। এ কারণে কৌতুক প্রিয়তা বশতঃ উভয় পাশের দুজন মওলা আলী শেরে খোদাকে লক্ষ্য করে বললেন- يا علي انت بيننا كان النون بين لنا অর্থা- ওহে আলী তুমি আমাদের মাঝে এমন তরো যেমনি আরী লানা (আমাদের জন্য) শব্দের মধ্যে নূন সদৃশ। মওলা আলী শেরে খোদা হায়দারে কররার (কঃ) উত্তর দিলেন,

ولو لم يكن النون في لنا لصارا لا অর্থাৎ- যদি লানা শব্দের মধ্যে 'নূন' না হতো তা হলে তো 'লা' (নয়) অবশিষ্ট থেকে যেতো। লা অর্থ হলো না। (অর্থাৎ- কথার মারপ্যাঁচে মাওলা আলী শেরে খোদা সঙ্গী দুই সাহাবীকে বুঝিয়ে দিলেন যে, তোমাদের মাঝে আমি ক্ষুদ্রাকৃতির হলেও মর্যাদার ক্ষেত্রে

তোমাদের ধারণা আমার ব্যাপারে সঠিক নয়। দৃশ্যতঃ আমি তোমাদের এক সাথে আছি বলে আমরা সবাই এক অভিন্ন কিন্তু এ সাদৃশ্যতা চূড়ান্ত নয়, আমার আত্মিক উচ্চ মর্যাদার ক্ষেত্রে ভিন্ন মাত্রাযুক্ত, কথাটি তিনি রসিকতার মাধ্যমে সূক্ষ্ম কথা দ্বারা বুঝিয়ে দিয়েছেন - সিরাজী)।

সূক্ষ্ম কথার উদাহরণঃ

সুলতানুল মাশায়েখ (কঃ) বলেন যে, একসময় কাজী কবির উদ্দীন, মাওলানা বোরহান উদ্দীন বলখী এবং কাজী হামিদ উদ্দীন নাগোরী এই তিনজন একত্রে কোথাও যাচ্ছিলেন। কাজী হামিদ উদ্দীন সাহেব খচ্চরের উপর সওয়ার ছিলেন। অপর দুইজন উত্তম এবং উচ্চ দেহবিশিষ্ট দুটি ঘোড়ার উপর সওয়ার ছিলেন। কাজী কবির উদ্দীন কাজী হামিদ উদ্দীনকে বললেন যে,

اسپ شما صغیر است ولے بزاز کبیر است

ফার্সি ভাষার এ বাক্যের অর্থ হলো- তোমার ঘোড়াটা তো ছোট কিন্তু মল তো অনেক বড়। (অর্থাৎ- ঘোড়া বা খচ্চরটি দেহের তুলনায় অনেক বড় বড় মলত্যাগ করে থাকে অথবা ঘোড়া ছোট হলে কী হবে মল-মুত্রের পরিমান তো অনেক বেশি। এখানে বাকপটুতা প্রকাশ পেয়েছে। হযরত কাজী হামিদ উদ্দীন নাগোরী যদিও বা একটি ছোট খচ্চরের উপর আরোহণ করেছেন তথাপিও তার মহত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব এতটুকুও ক্ষুণ্ন হয়নি। বিষয়টি উভয় সঙ্গী তাকে সসম্মানে শ্রদ্ধাভরে সুন্দর ও মাধুর্যপূর্ণ বাক্যের মাধ্যমে বুঝিয়ে দিলেন। কোন হেয় প্রতিপন্ন করা উদ্দেশ্য নয় বরং সূক্ষ্ম রহস্যমন্ডিত বাক্যের দ্বারা একটি সত্যকে প্রকাশ করা হলো। প্রকৃতপক্ষে খচ্চরটি ক্ষুদ্রাকৃতি এবং অপর দুই ঘোড়া তুলনামূলক বৃহদাকৃতির ছিল। এতদসত্ত্বেও আরোহীর সম্মান বুঝানোর জন্য রহস্যজনক কালাম করে বলা হয়েছে ঘোড়াটি ছোট হলেও তার মলত্যাগের ক্ষমতা বৃহদাকার ঘোড়ার চাইতেও অধিক। এখানে মলত্যাগ শব্দটা রূপকার্থে ব্যবহৃত হয়েছে। প্রকৃত মর্মার্থ হলো ফজিলত ও বরকত - সিরাজী)।

ঐ বাক্যটি বর্ণনা করার পর হযরত সুলতানুল মাশায়েখ বললেন- দেখ! কী সুন্দর কথা যে কথার উপর কোনরূপ সমালোচনা বা আপত্তি চলে না।

আওলিয়াগণ অন্তর্যামীঃ

সুলতানুল মাশায়েখ আরো বলেন যে, শেখ মুহাম্মদ আহল ছরজী (রহঃ) গজনী নগর থেকে বলখ শহরে আসলেন। যখন তিনি বাজারের মধ্য দিয়ে পথ চলছিলেন তখন মাওলানা বোরহান উদ্দীন বলখী উঠে দাঁড়ালেন। হযরত ছরজী এর শরীর মুবারক ও দৈহিক শক্তি দেখে মাওলানা বোরহান উদ্দীন মনে মনে বললেন যে, আওলিয়াল্লাহ কী এতো মোটা-তাজা হয়ে থাকে? তার মনে মনে এ ধারণা আসার সাথে সাথে শেখ ছরজী সাহেব তার দিকে ফিরে তাকালেন এবং বললেন, আমি এ কারণে মোটা হয়ে গেছি যে, আমি আমার বাপের মিরাছ (ত্যক্ত সম্পত্তি) খরীদ করেছি। এ কথা যখন মওলানায় শুনলেন তখন সামনে অগ্রসর হয়ে শেখ ছরজী (রহঃ)-এর পাক চরণে সম্মানী সিজদা করলেন এবং নিজের আকীদা দুরস্ত-সংশোধন করে নিলেন।

বাকপটুতার নিদর্শনঃ

সুলতানুল মাশায়েখ (কঃ) ইরশাদ করেন যে, শামসুল মুলক এর অভ্যাস ছিল যে, যদি কোন ব্যক্তি আগমনে বিলম্ব করত বা অনুপস্থিত থাকত অথবা তার কোন দোস্ত-বন্ধু দেরীতে আসত তখন তিনি বলতেন যে, আমি কী করেছি যাতে তুমি আসছ না? যদি কেউ অধ্যয়ন করত তখন তিনি বলতেন- আমরা কী করেছি? বলো তাহলে আমরাও অনুরূপ করবো। (অর্থাৎ- তোমার অধ্যয়নের বিষয়টি আমাদেরকে বলো, যে দিকে তুমি মনোনিবেশ করেছ সে বিষয়টি সম্পর্কে আমাদেরকে বললে আমরাও সে দিকে মনোনিবেশ করতে পারবো। কারণ আমরাও জ্ঞানার্জনে আগ্রহী, শুধু একা তুমি কেন অধ্যয়ন করবে, আমাদেরকে তোমার গবেষণার বিষয়টি সম্পর্কে অবহিত করলে আমরাও সে বিষয় নিয়ে গবেষণায় রত হতে পারব। এতটুকু কথাকে সংক্ষেপে এক রূপকার্থে বলেছিলেন- আমরা কী করলাম, আমরাতো কোন অপরাধ করিনি, তুমি যদি ব্যক্ত কর তাহলে তোমার বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে আমরাও জ্ঞান চর্চা করতে পারব, এটাও সূক্ষ্ম কথার পর্যায়ভূক্ত - সিরাজী)

সামসুল মুলক বলতেন- যদি আমার কোন বিলম্ব হতো অথবা আমি কোন দেরী করতে যেতাম তখন আমি ধ্যান করতাম যে, হয়ত আপনি আমাকেও এ কথাই বলবেন কিন্তু আমাকে এ কথা বলতো-

آخر کم از آنکہ گاہے بیائی و بما کنی نگاہے

উক্ত শেয়র বা ছন্দটি পাঠ করে হযরত সুলতানুল মাশায়েখ অশ্রুজলে নয়ন ভরে ফেলতেন। অতঃপর তাঁর জওক বা আস্বাদন ক্ষমতার এমন প্রভাব ছিল যে, উপস্থিত সকলের উপর তার আসর বিস্তার করল। কেননা হযরত সুলতানুল মাশায়েখ (কঃ) হযরত শামসুল মুলক এর নিকট থেকে

মকামাতে হারিরী নামক Arabic Literature বা আরবী সাহিত্য বই অধ্যয়ন করছিলেন এবং তার অধিকারগুলোকে সন্নিবেশিত রাখতেন। এরপর খাজা নিজাম উদ্দীন (কঃ) ইরশাদ করলেন যে, তিনি (শামসুল মুলুক) হিন্দুস্থান বা ভারতের বাদশাহ্‌র মুন্‌শী বা লিখক নিযুক্ত হয়েছিলেন। তাজরিয়াহ্ নামক জনৈক কবি তাঁর প্রশংসায় এ শেয়রটি বলেছিলেন-

صدر کنوں بہ کام دل دوستان سدی ﴿ مستوفی الملک ہندوستان شدی

তিনি শহরের মধ্যে সূক্ষাতিসূক্ষ্ম কথা বলা বা বাকপটুতার মধ্যে অদ্বিতীয় ছিলেন। একসময় কোন এক ভদ্রলোক শামসুল মুলুকের নিকট একখানা পত্র লিখলেন। যে পত্রটা এমন এক খারাপ কলম দ্বারা লিখা হয়েছিল যে সেটা পাঠ করা খুবই দুঃসাধ্য ছিল। তিনি তৎক্ষনাত উক্ত পত্রের পিছনের পৃষ্ঠায় লিখে দিলেন

انما فیکم خط کخط بط فی المشط فلا تکتب لنا

সুলতানুল মাশায়েখের একজন একনিষ্ঠ আলেম এবং ওয়ায়েজ ছিলেন। কিন্তু তার হস্তলিপি ছিল অসুন্দর। অতএব তার হস্তলিপি খুবই দীর্ঘ সময় ব্যয় করে পড়া হতো। একদা এই মওলানা নিজের হাতের লিখা নিয়ে সুলতানুল মাশায়েখের খিদমতে আসলেন, যে লিখাটা পাঠ করতে তার বহুক্ষণ সময় ব্যয় হয়েছিল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন- কী মওলানা এটা কি আপনার হাতের লিখা? মওলানা সাহেব নিজের অপারগতা প্রকাশ করল এবং আরজ করল যে, ওহে আমার শ্রদ্ধাভাজন! এই বান্দাহর স্বভাবজাত লিখা এটা। এ কথা শুনে সুলতানুল মাশায়েখ মুচকি হাসি দিয়ে বললেন- কতই না উত্তম স্বভাব। (অর্থাৎ- এ ক্ষেত্রেও স্বল্প কথায় মাধুর্যপূর্ণভাবে তিরস্কারের স্থলে এমন শব্দ প্রয়োগ করে দৃশ্যতঃ প্রশংসা করে দিলেন যাতে অন্তর্নিহিত ভাবধারাতে একটু তাচ্ছিল্যই বিদ্যমান রয়েছে। কিন্তু তা প্রত্যক্ষ নয় বরং পরোক্ষ। এটাই কথার সূক্ষ্মতা - সিরাজী)

মুর্শিদের নিকট সকল মুরীদ এক সমানঃ

একসময় অনেকগুলো বন্ধু হযরত সুলতানুল মাশায়েখের খিদমতে উপবিষ্ট ছিলেন। কিছুসংখ্যক ছিলেন ছায়াতে আর কিছু রোদের তাপে। তিনি ছায়াতে উপবিষ্টদের উদ্দেশ্যে বললেন যে, তোমরা অল্প ঠাসাঠাসি করে বস আর তাদেরকে ছায়াতে বসতে দাও। কেননা রোদে বসেছে তারা আর জ্বলছি আমি। (অর্থাৎ- প্রিয়ভাজন, স্নেহভাজন, বন্ধু-বান্ধব, মুরীদ, ভক্ত-আশেকানদের দুঃখ কষ্ট একজন মুর্শিদ, পীর, বুজুর্গ, ধর্মীয় নেতা আধ্যাত্মিক নেতা কখনো সহ্য করতে পারেন না, তাদের দুঃখে দুঃখী আর ব্যাথায় ব্যথিত হয়ে যান। সর্বদা তাদের কল্যাণ ও মঙ্গল কামনা করেন। একজন আদর্শবান ত্বরীকত পথ প্রদর্শক মুর্শিদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এখানে প্রস্ফুটিত হয়েছে। একজন সাজ্জাদানশীন-পীর মুর্শিদের এমন সহানুভূতি থাকা চাই। পরকল্যাণে নিজকে নিবেদিত রাখার শিক্ষাই এখানে প্রতিফলিত হয়েছে - সিরাজী)

একসময় দু'জন সুফিসাধক হযরত সুলতানুল মাশায়েখ (কঃ)-এর খিদমতে উপস্থিত হলেন। তিনি তাদেরকে সম্মান করলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন- কোথা হতে আগমন হলো? তাঁরা আরজ করলেন উছেহ হতে। তিনি পুনঃ জিজ্ঞাসা করলেন শেখ জামাল উদ্দীন উছেহ-এর অবস্থা কীরূপ? তিনি কী সুস্থ-শান্তিতে আছেন? তাঁরা আরজ করলেন শান্তিতে আছেন। হযরত সুলতানুল মাশায়েখ বুঝে গেলেন যে, উভয় সুফি ফার্সি ভাষার সাথে বেশি পরিচিত নন।

একটি রিয়াজতের ঘটনাঃ

সুলতানুল মাশায়েখ (কঃ) ইরশাদ করেন যে, ইমাম মুহাম্মদ হাসান শায়বানী (রহঃ)-এর পা মুবারকের মধ্যে ব্যথা ছিল। এ কারণে পা টেনে বসেছিলেন। এমতাবস্থায় তাঁর এক ছাত্র এসে তাঁকে সালাম করলেন। তিনি সালামের জবাব দিলেন এবং পা গুটিয়ে বসে গেলেন। রাত্রিকালীন সময় ছিল। ঐ ছাত্রটিকে তাঁর কোন এক জরুরী কাজে কোথাও পাঠনোর প্রয়োজন ছিল। যখন তিনি তাকে ইশারা করলেন সাথে সাথে সে রওয়ানা হয়ে গেল। ইঙ্গিত অনুযায়ী যেদিকে গেল সেদিকে কোন রাস্তা ছিল না, বরং সেদিকে ছিল জঙ্গল ও বন। কিন্তু গুরুর আদেশে সে সেদিকেই যাত্রা শুরু করল। কয়েক ক্রোশ পথ অতিক্রম করতে সক্ষম হলো। দেখতে পেল সম্মুখে একটি পাহাড়। যখন সে পাহাড়ের চূড়ায় গিয়ে পৌছল তখন দেখতে পেল সেখানে একজন নূরানী সুরতের পুরুষ ক্বিবলামুখী হয়ে বসে আছেন। উক্ত পীর ব্যক্তি একটি জলপাত্র ভর্তি ঠাণ্ডা পানি এবং দুটি রুটি তাকে খেতে দিল। যখন সে খাওয়া শেষ করল তখন ঐ নূরানী সাধু পুরুষটি তাকে দ্বিতীয় আরেকটি পাহাড়ের দিকে ইঙ্গিত করে সেদিকে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। সে গিয়ে দ্বিতীয় পাহাড়েও পূর্বের ন্যায় একজন বৃদ্ধ বুজুর্গের সন্ধান পেল। তিনিও প্রাগুক্ত সাধুজনের ন্যায় আচরণ করলেন। অতঃপর তিনি তাকে তৃতীয় আরেকটি পর্বতের দিকে ইঙ্গিত করে সেখানে গমনের

নির্দেশনা দিলেন। যখন সে সেখানে পৌঁছলো তখন সেখানকার পীর ব্যক্তিটি বললেন যে, এই পাহাড়ের চূড়াতে কালিওয়ার নামক একটি দুর্গ আছে। ঐ কিল্লা বা দুর্গটিকে সুলতান শামসুদ্দিন সাত মাস ধরে অবরুদ্ধ করে রেখেছেন। কিন্তু কোন প্রকারে সেটি জয় করতে পারছেন না। সে কারণে তিনি খুবই দুশ্চিন্তার মধ্যে রয়েছেন। তুমি তার কাছে যাও, গিয়ে বল যে, সৈন্যদলকে অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক সময়ে যেন প্রেরণ করেন। তাতে কিল্লাহ্ ফতেহ্ বা দুর্গটি জয় হয়ে যাবে। মাওলানা শামসুদ্দিন বলেন যে, যখন আমি উক্ত অলিয়াল্লার নির্দেশনা অনুযায়ী সুলতান শামসুদ্দিন-এর রাজপ্রাসাদের নিকটে আসলাম তখন দারোয়ান ও প্রহরীর মাধ্যমে সংবাদটি সুলতানের নিকট পৌঁছালাম। এতে বাদশাহ্ আমাকে ডেকে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন যে, তুমি কী করে জানলে যে, অমুক মাসের অমুক তারিখের অমুক সময়ে দুর্গটি জয় হয়ে যাবে? আমি বললাম- আপনি কী বাস্তবেই কিল্লাহটি ফতেহ্ হওয়াটা চান? তাহলে যতক্ষণ না কিল্লাহটা জয় হচ্ছে ততক্ষণ আমাকে নজরবন্দী করে রাখেন। যদি কিল্লাহ্ জয় না হয় তাহলে আমার খুন (রক্ত) আপনার জন্য মুবাহ্ (বৈধ) হবে। অর্থাৎ- আমাকে প্রাণে বধ করে ফেলবেন। অতঃপর আমাকে নজরবন্দী করে রাখা হলো। যখন জয়লাভের প্রতিশ্রুতি সন্নিকটে আসল তখন আমাকে বাদশাহের কাছে নিয়ে যাওয়া হলো। আমি বললাম আরোহী সৈন্য ও পদাতিক সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত হওয়ার আদেশ দিন। প্রস্তুত হয়ে সেনাদল যখন প্রচণ্ড আক্রমণ করলো তাতে ঐ মজবুত কিল্লাটি মুহূর্তের মধ্যে আল্লাহ্র রহমতে জয় হয়ে গেল। সেখানকার সাতশত সর্দার বা নেতৃত্বদানকারী ব্যক্তিবর্গ বাদশাহের সম্মুখে সাজাপ্রাপ্ত হলো। এতে সুলতান শামসুদ্দিন আমাকে (মাওলানা শামসুদ্দীন রহঃ)কে অনেক তাজীম ও সম্মান করেন। এ ঘটনায় সন্তুষ্ট হয়ে মাওলানাকে বাদশাহ্ বদাও অঞ্চলের চারটি গ্রাম জায়গীর বা কর্তৃত্ব প্রদান করলেন।

অকল্যাণকর স্থান পরিত্যাজ্যঃ

সুলতানুল মাশায়েখ (কঃ) বলেন যে, যখন শেখ জালালুদ্দিন তাবরিজী শহরে আগমন করলেন, তিনি এখানে ভ্রমণ শেষে এখান থেকে হিন্দুস্তানের দিকে গমন করবেন। শেখ জালালুদ্দিন তাবরিজী বললেন যে, যখন আমি শহরে আসলাম তখন আমি স্বর্ণ ছিলাম। আর এখন আমি রূপা হয়েছি। আরো বেশি সময় ধরে যদি এখানে অবস্থান করি তাহলে জানিনা আমি কী হয়ে যাই। (অর্থাৎ- তখনকার তাবরিজ শহর এর পরিবেশ এমন ছিলো যে, কোন ভাল লোক সেখানে প্রবেশ করলে তার আধ্যাত্মিক অবনতির সূত্রপাত হতো। বেশিদিন সেখানে অবস্থান করলে অবনতির চূড়ান্ত পর্যায়ে গিয়ে ধ্বংস হয়ে যাওয়ার উপক্রম হতো, তাই তিনি এ ধরণের মন্দ পরিবেশ ত্যাগ করে অন্যত্র বিশেষতঃ ভারতে চলে যাবার ইচ্ছে করছিলেন।

কারণ তখনকার সময়ে ভারতে অসংখ্য ওলী-আওলিয়ার অবস্থান ছিল। তাদের সোহবতে এসে মানুষ পরশপাথরে পরিণত হয়ে যেত। আল্লামা রূমী (রহঃ) মসনবী শরীফে বর্ণনা করেছেন-

গরতু ছঙ্গে খারা ও মরমর শোবী - গর বছাহেব দিল রছি গাওহার শবী।

মানে- তুমি যদি রাস্তার পাথর বা মর্মর পাথরও হও, কিন্তু আওলিয়ার সংশ্রবে গেলে তুমি মণি-মুক্তা হয়ে যাবে। - সিরাজী) পৃষ্ঠা- ৫৩৪।

সূফি উদ্ধৃতি

- আউলিয়াদের পক্ষে শ্বাস-প্রশ্বাসের প্রতি লক্ষ্য রাখা অপেক্ষা কঠিন কোন কাজ নেই।
- স্বাদে তৃপ্তি আর চেষ্টায় বিশ্বাস এ দু'টোকে ত্যাগ করতে পারলেই দাসত্বের হক আদায় হয়।
- নিজেকে নিয়ামতের অনুপযুক্ত বলে ধারণা করাই শোকর বা কৃতজ্ঞতা।
- যে স্থানে মিথ্যা না বললে রক্ষা পাওয়া মুশকিল সে স্থানেও মিথ্যা না বলা প্রকৃত সত্যনিষ্ঠা।
- প্রকৃত ফকীরের লক্ষণ হল সে কারও কাছে কিছু চায় না, কারও সাথে ঝগড়া করে না, কেউ ঝগড়া করতে চাইলেও চুপ করে থাকে।

–হযরত জুনাইদ বাগদাদী (রহঃ)

ঈদুল ফিতরের ধর্মীয় ও ব্যবহারিক তাৎপর্য

● ড. মুহম্মদ আবদুল মান্নান চৌধুরী ●

'ঈদ' অর্থ আনন্দ বা সুখ। 'ফিত্‌র' অর্থ সদ্‌কা প্রদান বা দান করা। সুতরাং ঈদুল ফিত্‌র হল গরীব এবং নিঃস্ব লোককে সদকা প্রদান কিংবা দান করার আনন্দ। প্রকৃতপক্ষে, ঈদুল ফিতরের আনন্দ বা তাৎপর্য ধনীদের উদ্বৃত্ত সম্পদ গরীব এবং দুঃখী মানুষের মধ্যে বন্টনের মাঝে নিহিত। প্রত্যেক বৎসর রমজানের পবিত্র মাস ত্যাগ, উৎসর্গ, আত্ম-সংযম, আত্মার পরিশুদ্ধিকরণ এবং সীমাহীন খোদায়ী পুরস্কারের বার্তা নিয়ে আমাদের মাঝে আগমন করে। পবিত্র রমজান মাসের বিদায়ের পর ঈদুল ফিত্‌র আসে রোজাদারদের জন্য আশীর্বাদ, ক্ষমা ও নাজাত বা মাগফিরাতের আনন্দ নিয়ে। আল্লাহ্‌র প্রতি ভীতি বা 'তাকওয়া' এবং চরিত্র পরিশুদ্ধকরণের গুণ অর্জনের জন্য পবিত্র রমজানে সুদীর্ঘ এক মাসের প্রশিক্ষণ শেষে শাওয়ালের নতুন চাঁদ পশ্চিমাকাশে উদিত হয় প্রতিটি মুসলমানের ঘরে ঘরে ঈদুল ফিতরের আগমনী বার্তা পৌঁছিয়ে দেয়ার জন্য। সারা মুসলিম বিশ্ব স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঈদের আনন্দঘন মহা উৎসব উদযাপনের জন্য উৎসাহী হয়ে উঠে। সারা বিশ্বের প্রায় ১৫০০ মিলিয়ন মুসলমানের হৃদয় ছুঁয়ে যায় ঈদুল ফিতরের আনন্দ।

ধনী-দরিদ্র, সাদা-কাল, আশরাফ-আতরাফ, নির্বিশেষে সকল মানুষের জন্য ঈদের বার্তা আনন্দ নিয়ে আসে। এশিয়া, ইউরোপ, অস্ট্রেলিয়া, আফ্রিকা, আমেরিকাসহ সকল মহাদেশের প্রতিটি স্থানে যেখানেই মুসলিম বাস করে, সেখানেই অবতীর্ণ হয় ঈদ। ঈদের আনন্দ উপভোগ করার ক্ষেত্রে সকল মুসলমানের সমান অধিকার। ভৌগোলিক সীমারেখার সাথে ঈদের কোন সম্পর্কে নেই। বিশ্বাস এবং আদর্শগত পার্থক্যের সাথেও ঈদের কোন সংঘাত নেই। মুসলমান কোন ভৌগোলিক জাতি সত্তা নয়, ভাষাভিত্তিক বা কেবলমাত্র ধর্মীয় জাতি নয়। মুসলিম হচ্ছে একটি উম্মাহ্‌র নাম। মুসলিম বলতে মুসলিম উম্মাহ্‌কে বুঝায়। মুসলিম হচ্ছে একটি ঐতিহ্যবাহী আদর্শগত জাতি। বিশ্বের সকল মুসলমান একই বিশ্বাস, আদর্শ এবং ধর্মীয় সংস্কৃতির অনুসারী। মহানবী (দঃ) বলেছেন, "সমগ্র মুসলিম উম্মাহ্‌ হচ্ছে একটি মানব দেহের মত। যদি এই দেহে কোন অংশ অসুস্থ হয়ে পড়ে, সারা দেহ যন্ত্রনায় কাতর হয়ে পড়ে।" এটা আসলেই সত্য। যদি কোন মুসলমান দূর প্রাচ্যের ফিলিপাইনে, মধ্য এশিয়ার আফগানিস্তানে, মধ্যপ্রাচ্যের প্যালেস্টাইনে, আফ্রিকার আলজেরিয়ায়, ইউরোপের বসনিয়া এবং চেচনিয়ায় বিপদগ্রস্ত হয়, বাংলাদেশের মুসলমানগণ ব্যথায় কাতর হয়ে পড়ে, চিন্তায় উদ্বিগ্ন হয়ে উঠে। আনন্দের ক্ষেত্রেও এই কথা প্রযোজ্য।

সারা বিশ্বের মুসলমানগণ ঈদের আনন্দ সমভাবে ভাগাভাগি করে থাকে। ঈদ সারা বিশ্বের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে পড়ে। প্রত্যেক জাতির কিছু কিছু আনন্দ উৎসব আছে। কিন্তু মুসলমানদের ঈদ উৎসব অন্যান্য জাতির আনন্দ উৎসব থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। মুসলমানদের ঈদ উৎসব কেবলমাত্র আনন্দ এবং সুখ দেয় না, এটা মানবতার প্রতি শ্রদ্ধা জানায় এবং মানবিক মূল্যবোধকে উর্ধে তুলে ধরে। ঈদ হচ্ছে সাম্য, মৈত্রী, ভ্রাতৃত্ব, স্নেহ-মমতা, সংহতি এবং সার্বজনীনতার একটি অতুলনীয় উদাহরণ বা প্রতীক। বিগত প্রায় ১৫০০ বৎসরেরও অধিককাল ধরে ঈদ উৎসব পালিত হয়ে আসছে। মহানবী (দঃ) যখন মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করেন, তখন তিনি দেখতে পান যে, সেখানকার অধিবাসীরা পূর্ণিমার রাত এবং বসন্তকালের রাত্রিতে লোকেরা মেহেরজান এবং নওরোজ নামে দু'টো উৎসব পালন করে। তিনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমাদের উৎসবগুলো কী রকম?' তারা বলল, 'আমরা বিভিন্ন কৌতুক, খেলা-ধূলা এবং আমোদ-প্রমোদ করে এ দু'টো উৎসব পালন করে থাকি।' মহানবী (দঃ) বললেন, 'শুন! আল্লাহ্‌তায়ালা তোমাদের জন্য দু'টো গৌরবময় উৎসবের দিন উপহার দিয়েছেন যেগুলো আইয়ামে জাহেলিয়ার উক্ত দু'টো উৎসব থেকে অনেক উত্তম। এ দু'টো দিন হচ্ছে ঈদুল ফিতর এবং ঈদুল আজহার দিন। এখন থেকে তোমরা এ দু'টো দিনকে আনন্দ ও সুখের দিন হিসেবে উদযাপন করবে।' সে সময় থেকে অদ্যাবধি প্রায় ১৫০০ বৎসরেরও অধিককাল ধরে মুসলমানগণ উক্ত দু'টো দিনকে ঈদ বা আনন্দের দিন হিসেবে উদযাপন করে আসছে। সুদীর্ঘ এক মাস যাবত পবিত্র রমজান মাসের রোজা রাখার পর আল্লাহ্‌তায়ালা ঈদুল ফিতরকে মুসলিম উম্মাহ্‌র জন্য পুরস্কার, সাফল্য, নাজাত, ক্ষমা এবং আশীর্বাদের দিন হিসেবে অবতীর্ণ করেন। মহান আল্লাহ্‌ বলেন, 'সেই সফলকাম যে আত্মশুদ্ধি অর্জন করেছে, আর প্রভুকে স্মরণ করেছে এবং নামাজ আদায় করেছে।' (আল কুরআন)। মহানবী (দঃ) বলেন, 'ঈদের দিনে ফিরিশ্‌তারা আকাশ থেকে ধরাধামে নেমে আসে এবং রাস্তার বিভিন্ন স্থানে অবস্থান গ্রহণ করে ডাকতে থাকে, "ওহে মহানবী (দঃ)-এর উম্মতগণ! তোমরা আস এবং আল্লাহ্‌র দরবারে হাজির হও। তোমাদের ঘর থেকে বের হয়ে আস। আল্লাহ্‌ তোমাদেরকে পুরস্কৃত করবেন।" আল্লাহ্‌র বান্দারা মসজিদে কিংবা ঈদগাহে ঈদের নামাজ আদায় করতে যায়, তখন আল্লাহ্‌তায়ালা ফিরিশ্‌তাদেরকে সম্বোধন করে বলেন, "যারা ঈদের নামাজ পড়ার জন্য উপস্থিত হয়েছে তাদের পুরস্কার কী হওয়া উচিত?" ফিরিশ্‌তারা উত্তরে বলেন, "ওহে প্রভু! আপনি তাদেরকে তাদের প্রাপ্য দিয়ে দিন।" তখন আল্লাহ্‌ বলেন, "ওহে বান্দারা! তোমরা আমার কাছে কিছু চাও। আমি আমার ইজ্জতের কসম খেয়ে বলছি, তোমরা যদি এ বিশাল জামাতে পরকালের জন্য কিছু চাও, তা আমি অবশ্যই দেব।

আর যদি এ পার্থিব জগতের জন্য কিছু চাও, সেটাও আমি বিবেচনা করব। (যদি সেটা তোমার জন্য প্রযোজ্য হয়)। তোমরা একজন নিষ্পাপ শিশুর মত বাড়ি ফিরে যাও। তোমরা আমাকে সন্তুষ্ট করেছ এবং আমি তোমাদের উপর সন্তুষ্ট।" (আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাঃ থেকে বর্ণিত হাদীস; বায়হাকি)।

অনুরূপ একটি হাদীস হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকেও বর্ণিত হয়েছে। মহানবী (দঃ) আরও বলেন, "পবিত্র রমজান মাসের শুরু থেকে লায়লাতুল কদর পর্যন্ত প্রতি মুহূর্তে ষাট হাজার দোযখগামী লোককে মুক্ত করে দেন, লায়লাতুল কদর পর্যন্ত যতসংখ্যক লোককে দোযখের আগুন থেকে মুক্তি দেয়া হয়, কেবল লায়লাতুল কদরের রাত্রে সমসংখ্যক লোককে দোযখের আযাব থেকে মাফ করা হয় এবং পবিত্র রমজান মাসের শুরু থকে লায়লাতুল কদর পর্যন্ত যত লোককে দোযখের আযাব থেকে মাফ করা হয় এবং লায়লাতুল কদরের রাত্রে যতজনকে মাফ করা হয়, কেবলমাত্র ঈদুল ফিতরের দিনে উভয় প্রকারের সংখ্যার সমসংখ্যক লোককে দোযখের আযাব থেকে মাফ করা হয়।" (তানভীহুল গাফেলীন)। সুতরাং ঈদুল ফিতর যে মহা গৌরবান্বিত ও সৌভাগ্যের দিন তা' বলার অপেক্ষা রাখেনা। দু'রাকাত ঈদের নামাজ আদায় এবং মসজিদে বা ঈদগাহে ইমামের খুত্‌বা শুনার মধ্য দিয়ে ঈদের উৎসবের আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয়। লোকজন নুতন জামাকাপড় পড়ে, বিভিন্ন সুগন্ধি ব্যবহার করে এবং তাদের আত্মীয়-স্বজন, ছেলে-মেয়েকে সাথে নিয়ে ঈদগাহে কিংবা মসজিদে জামাতের সাথে ঈদের নামাজ পড়তে যায়। ঈদের নামাজ পড়ার পরপর মুসল্লিরা একে অপরের সাথে কোলাকুলি করে এবং সকল প্রকার শত্রুতা, হিংসা-ঘৃণা ভুলে যায়। তারা প্রত্যেকে একে অপরের বন্ধু হয়ে যায়। ঈদের এ পবিত্র পরিবেশ সত্যি বিস্ময়কর! ছোটরা বড়দেরকে সালাম করে, পিতামাতাকে কদমবুচি করে, বন্ধুরা পরস্পর শুভেচ্ছা জানায়। এভাবে ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময়ের মাধ্যমে একে অপরের কাছাকাছি আসে, সকল ভেদাভেদ ভুলে যায়। কবরস্থানে গিয়ে মুরব্বী ও আত্মীয় স্বজনদের স্মৃতি রোমন্থন করে। আজ ধনী-গরীব, সাদা-কাল, উঁচু-নিচু এরূপ কোন তফাৎ নেই। সবাই একে অপরের সাথে খোলা মন ও আন্তরিকতা নিয়ে পরম শ্রদ্ধায় কিংবা ভালবাসায় আলিঙ্গন করে, জড়িয়ে ধরে আত্মার স্পর্শ নিবেদন করে। সাম্য, মৈত্রী, সার্বজনীন ভ্রাতৃত্বের এ উদাহরণ সত্যি বিরল। লোকজন আত্মীয় স্বজন, বন্ধুবান্ধব ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের বাড়ী বা বাসায় যায় এবং একে অপরের খোঁজখবর নেয়। মেহমানদেরকে সাদর সম্ভাষণ জানানো হয় এবং উত্তম নাস্তায় আপ্যায়ন করা হয়। প্রত্যেকে যার যার সামর্থ্য অনুসারে আপ্যায়ন করে। বিভিন্ন রকমের মিষ্টি এবং সুস্বাদু খাবার পরিবেশন করা হয়। মেহমান এবং আপ্যায়নকারী উভয় পক্ষই আনন্দ উপভোগ করে। এরূপ ব্যবস্থা মান-মর্যাদা নির্বিশেষে সকলের মাঝে সামাজিক এবং মানবিক বন্ধন সুদৃঢ় করতে সাহায্য করে।

জনগণ তাদের নিজের জন্য, তাদের আত্মীয় স্বজন এবং বন্ধু-বান্ধবদের জন্য নুতন জামা-কাপড় ক্রয় করে এবং আত্মীয় স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদেরকে উপহার হিসেবে প্রদান করে। চাকুরীজীবী, ব্যবসায়ী, ছাত্রছাত্রী, কৃষক-শ্রমিক - সকল শ্রেণীর মানুষ তাদের নিজের বাড়ী ছুটে যায় নৌকা, স্টিমার, জাহাজ, বাস, ট্রেন, ট্যাক্সী প্রভৃতি বাহনযোগে প্রচণ্ড কষ্ট করে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ঈদ উৎসব পালনের জন্য, তাদের স্বজনদেরকে এক নজর দেখার জন্য। এটা হচ্ছে আন্তরিকতা, সম্প্রীতি, সহানুভূতি, সংহতি, স্নেহ-মমতা ও সহমর্মিতার একটি অতুলনীয় উদাহরণ। আল্লাহ্‌তায়ালা ধনী মুসলমানদের উপর গরীব, সম্পদহীন ও নিঃস্বদেরকে ফিত্‌রা দেয়া বাধ্যতামূলক করেছেন যাতে করে তারা ধনীদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ঈদ উদযাপন করতে পারে এবং সমভাবে ঈদের আনন্দ ভাগাভাগি করে নিতে পারে। ঈদের ফিত্‌রা ঈদের নামাজে যাবার পূর্বে প্রদান করতে হবে যাতে গরীবরা নুতন কাপড়-চোপড়, মিষ্টি খাবার ইত্যাদি ঈদ উদযাপনের জন্য ক্রয় করতে পারে। ধনীদেরকে অবশ্যই গরীবদের জন্য ফিত্‌রা প্রদান করতে হবে। নতুবা তাদেরকে কঠোর শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে। মহানবী (দঃ) বলেন, "যদি একজন রোজাদার সাদাকাতুল ফিত্‌র প্রদান না করে, তা'হলে তার রোজা আকাশ এবং দুনিয়ার মাঝে ঝুলতে থাকবে। তার রোজা কবুল হবে না।" ইসলাম আমাদেরকে সাম্য এবং ভ্রাতৃত্বের শিক্ষা দেয়।

আল্লাহ্‌তায়ালা হচ্ছেন পৃথিবীর সকল সম্পদের মালিক। আমরা হচ্ছি তাঁর প্রতিনিধি বা খলিফা। পবিত্র কুরআন এবং হাদীসের নীতিমালা অনুযায়ী আমাদেরকে অবশ্যই সম্পদের ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। নতুবা আমাদেরকে পরকালে আমাদের অন্যায় কাজের জন্য জবাবদিহি করতে হবে। আমাদেরকে অবশ্যই গরীব এবং দুঃখীদেরকে সাহায্য করতে হবে। আল্লাহ্‌তায়ালা গরীবদের ক্ষুধার জ্বালা কেমন তা উপলব্ধি করার জন্য রোজাকে বাধ্যতামূলক করেছেন এবং এজন্য গরীবদের ভোগান্তি লাঘবের উদ্দেশ্যে আল্লাহ্‌তায়ালা ধনীদের উপর যাকাত প্রদান বাধ্যতামূলক করেছেন। মহানবী (দঃ) কখনও একজন ক্ষুধার্ত লোকের সাথে ভাগাভাগি না করে তাঁর খাবার খেতেন না। মহানবী (দঃ) বেলন, "যে গরীব এবং দুঃখীদেরকে সাহায্য করল, সে যেন জেহাদ করল।" মহানবী (দঃ) আরও বলেন, "যদি কেউ সাদাকাতুল ফিত্‌র বা ফিত্‌রা দেয়, সে আল্লাহর তরফ থেকে দশটি পুরস্কার পাবে। দশটি পুরস্কার হচ্ছে নিম্নরূপঃ

(ক) তার দেহ পাপ থেকে মুক্ত করা হবে; (খ) দোযখের আগুন থেকে রক্ষা পাবে; (গ) তার রোজা আল্লাহ্ কবুল করবেন; (ঘ) তার জন্য বেহেশ্‌ত নিশ্চিত হবে; (ঙ) সে কবর থেকে নিরাপদে

উত্থিত হবে; (চ) তার সকল পুণ্য কাজ বা নেক আমল গৃহীত হবে; (ছ) শেষ বিচারের দিনে তার জন্য মহানবী (দঃ)-এর সুপারিশ ওয়াজিব হবে; (জ) চোখের পলকে সে পুলসিরাত পার হয়ে যাবে; (ঝ) তার পুণ্যের পাল্লা ভারী হবে; (ঞ) তার নাম যদি হতভাগ্যের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়, মহান আল্লাহ্তায়ালা ঐ তালিকা থেকে তার নাম মুছে দেবেন।" (শেখ জাদাহ্ হাশিয়াহ্, তফসিরে বায়জবী)।

একদা মহানবী (দঃ) ঈদের নামাজ শেষে তাঁর ঘরে ফিরছিলেন। পথে একজন বালক বসে বসে কাঁদছিল। মহানবী (দঃ) স্নেহবশে ছেলেটির মাথার উপর তাঁর পবিত্র হাত রাখলেন এবং বালকটিকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কাঁদছ কেন?" বালকটি উত্তর দিল, "আমার বাবা যুদ্ধে মারা গেছেন। আমার মাও মারা গেছেন। আমি অসহায়।" মহানবী (দঃ) ছেলেটিকে শান্তনা দিলেন। মহানবী (দঃ) ছেলেটিকে তাঁর ঘরে নিয়ে গেলেন এবং হযরত আয়েশা (রাদ্বিঃ)কে বললেন, "আমি এ বালকটিকে তোমার জন্য নিয়ে এসেছি।" মা আয়েশা (রাদ্বিঃ) ছেলেটিকে কোলে তুলে নিলেন। তাকে নিজ হাতে গোসল করালেন, নুতন জামা-কাপড় পরালেন এবং পরম আদরে খাওয়ালেন। মহানবী (দঃ)-এর আদরের দুলালী মা ফাতেমা জাহ্রা (রাদ্বিঃ)ও ছেলেটিকে সীমাহীন আদর-যত্ন করলেন। ঈদের দিনে আমরা গরীব, অসহায় এবং নিঃস্বদের প্রতি কিরূপ আচরণ করবো এটা হচ্ছে তার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। আমাদের দেশে গরীব এবং নিঃস্ব ব্যক্তিদেরকে রমজান মাসে যাকাত সামগ্রী বিতরণের ক্ষেত্রে কোন কোন সময় মর্মান্তিক দুর্ঘটনা সংঘটিত হতে দেখি যা মোটেও কাঙ্ক্ষিত নয়। জনতার সারিতে যাকাত নেয়ার জন্য ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে ঢাকা শহরের অদূরবর্তী এক ধনী লোকের বাসভবনের সামনে ১৯৮০ সালের আগস্ট মাসের ১৭ তারিখে দু'জন শিশুসহ ১৫জন ভিক্ষুক মারা যায় পদদলিত হয়ে। একই ধরণের দুর্ঘটনা চট্টগ্রাম, চাঁদপুরসহ দেশের অন্যান্য শহরেও সংঘটিত হতে দেখা যায়। এরূপ প্রতিকূল সামাজিক পরিবেশ যদি বিদ্যমান থাকে, তাহলে ঈদের আনন্দ মাটি হয়ে যাবে। বাংলাদেশে ঈদ আসে সুবিধাবঞ্চিত ও দারিদ্র্যপীড়িত মানুষদের ঘরে ক্ষণিকের তরে আনন্দের বার্তা নিয়ে। অভাব এবং বঞ্চনার কারণে ঈদের প্রকৃত তাৎপর্য অবহেলিত হয়। ঈদ এদেশে ধনী লোকদের বিলাসিতা এবং গরীবদের বঞ্চনার মধ্যে প্রতিযোগিতার সৃষ্টি করে যা সম্পূর্ণরূপে অনভিপ্রেত। আমরা কি ধনী-দরিদ্র, উঁচু-নিচু, কাল-সাদা নির্বিশেষে মহানবী (দঃ)-এর আদর্শ অনুসরণে শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা করে সকলের মাঝে ঈদের আনন্দ সমভাবে ভাগাভাগি করে নিতে পারি না? আমাদেরকে অবশ্যই তা করতে হবে। এ মহান লক্ষ্য অর্জনে আমাদের বিবেককে জাগ্রত করতে হবে। এটা খুবই দুঃখজনক যে, ঈদের প্রাক্কালে আমাদের ব্যবসায়ীরা খাদ্যদ্রব্য এবং কাপড়-চোপড়ের দাম বাড়ানোর জন্য কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করার লক্ষ্যে মওজুদদারী, মুনাফাখোরীসহ বিভিন্ন অনৈতিক কর্মকান্ডের আশ্রয় গ্রহণ করে থাকে যার ফলে উল্লেখিত দ্রব্যসমূহ ভোগ করা থেকে গরীবরা বঞ্চিত হয় এবং দ্রব্যমূল্য নাগালের বাইরে চলে যাবার দরুন সাধারণ নিম্নবিত্ত লোকজনও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এটা ঈদুল ফিতরের আদর্শের পরিপন্থি। যে কোন প্রকারে এ ধরণের মানসিকতা ও আচরণ পরিহার করতে হবে।

ঈদুল ফিতরের আনন্দ হবে শরীয়তের নীতিমালার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। ঈদের আনন্দের নামে অশ্লীল ও নগ্ন নাচ-গান, অশ্লীল সিনেমা, যুবক-যুবতীদের অবাধ মেলামেশা, জুয়াখেলা প্রভৃতি অসামাজিক কার্যকলাপ ঈদুল ফিতরের প্রকৃত চেতনাকে ব্যাহত করে। এগুলো সম্পূর্ণরূপে নিরুৎসাহিত করতে হবে। তা যদি করা না হয়, তাহলে ঈদ আমাদের জন্য অভিশাপে পরিণত হবে এবং আমরা পরকালে শাস্তির সম্মুখীন হব। মহানবী (দঃ) বলেছেন, "ঈদুল ফিত্রের দিন যখন আসে, তখন মহান আল্লাহ্তায়ালা ফিরিশ্তাদের কাছে তাঁর রোজাদার বান্দাদের জন্য গর্ব করেন এবং বলেন, "কাজের শেষে সকল শ্রমিক পারিশ্রমিকের জন্য দরখাস্ত করে। আমার বান্দারা সুদীর্ঘ এক মাস কাল রোজা রেখেছে। তারা এখন ঈদের জামাতে দাঁড়িয়েছে। তারা তাদের পুরস্কারের জন্য প্রার্থনা করছে। তোমরা (ফিরিশ্তারা) এদের জন্য সাক্ষী থাক। আমি তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছি। তখন একজন ফিরিশ্তা বলবেন, 'হে মহানবী (দঃ)-এর উম্মতগণ! তোমরা এখন বাড়ী ফিরে যাও। তোমাদের পাপগুলো পুণ্য কাজে (নেক আমলে) রূপান্তরিত হয়েছে। অতপর মহান আল্লাহ্তায়ালা বলবেন, "তোমরা সুদীর্ঘ এক মাস রোজা রেখেছ এবং ইফতার করেছো আমার সন্তুষ্টির জন্য। সুতরাং তোমরা সম্পূর্ণ নির্দোষ ও নিষ্পাপ হয়ে বাড়ী ফিরে যাও।" (হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ রাদ্বিঃ থেকে বর্ণিত হাদীস, বায়হাকি)।

মুসলমানগণ পবিত্র রমজান মাস সুদীর্ঘ এক মাস যাবত আত্ম-সংযম, সততা, সত্যবাদিতা, ত্যাগ, উৎসর্গ, খোদাভীতি, আল্লাহ্র প্রতি আনুগত্য, নিয়মানুবর্তিতা ও সময়ানুবর্তিতার জন্য প্রশিক্ষণ নিয়ে থাকে। ঈদুল ফিত্র হচ্ছে পবিত্র রমজান মাসের প্রশিক্ষণান্তে সমাপনী উৎসব। আসুন, বাকী এগার মাসের জন্য আমাদের দৈনন্দিন জীবনে এ দীর্ঘ প্রশিক্ষণের শিক্ষা কার্যকর ও দক্ষভাবে বাস্তবায়ন ও প্রয়োগ করি যাতে করে ঈদুল ফিত্র সত্যিকার অর্থে আমাদের জন্য অর্থবহ ও উপকারী হয়। আমরা কি পবিত্র রমজান মাসের শিক্ষার আলোকে আমাদের জীবন সমাজকে বিনির্মাণ করতে পারিনা? আমাদেরকে আমাদের চূড়ান্ত গন্তব্যস্থল পরকালের জন্য যাত্রার প্রস্তুতি কতটুকু তা মূল্যায়নের জন্য আত্মসমালোচনা করতে হবে। মহান আল্লাহ্তায়ালা আমাদের সীমাবদ্ধতা কতটুকু তা উপলব্ধি করার জন্য এবং সীমাবদ্ধতাসমূহ দূরীকরণের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য তওফিক আতা করুন। আমিন! বেহুরমতে সাইয়েদিল

হযরত জাফর আত-তাইয়ার (রাদ্বিঃ)
উদ্বাস্তু হয়ে আফ্রিকায় বয়ে নিয়ে গেছেন ইসলামের পতাকা

● অনুবাদঃ মুহাম্মদ ওহীদুল আলম ●

খাইবার বিজয়

খাইবারে ইহুদীদের ছিল শক্তিশালী ঘাঁটি। ফলে নবগঠিত মদীনা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে তারা নানা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল। মদীনা মুনাওয়ারার মুসলিম বাহিনী খাইবার অভিযানের প্রস্তুতি গ্রহণ করে।

খাইবারের ইহুদীরা ইসলামের প্রজ্জ্বলিত শিখাকে নিভিয়ে দেয়ার সর্বাত্মক প্রচেষ্টায় লিপ্ত ছিল। তারা আরব গোত্রগুলোকে মদীনা আক্রমণের জন্য সর্বদা প্ররোচিত করত। তাদের উদ্দেশ্য ছিল সদ্যগঠিত মদীনা রাষ্ট্রকে ধ্বংস করা। রসূলে আকরাম (সাঃ) ইহুদীদের ষড়যন্ত্রকে প্রতিহত করতে মনস্থ করেন যাতে জনসাধারণ শান্তিতে বসবাস করতে পারে। এক পর্যায়ে মুসলিম মুজাহিদ বাহিনী গাফফান গোত্র ও খাইবারের ইহুদীদের সংযোগ সড়কে উপনীত হয়। এতে শত্রুরা বিস্মিত হয়ে পড়ে। মুসলিম বাহিনীতে ১৪০০ যোদ্ধা ছিলেন। তাঁদের সাথে ২০০ অশ্বারোহী সৈন্যও ছিলেন। মুসলিম মহিলারাও এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তাঁরা ইহুদীদের ঘাঁটির দিকে অগ্রসর হন। মুসলিম বাহিনী সকালে ইহুদীদের অবরোধ করেন। কিছু কিছু সাহসী যোদ্ধা ইহুদীদের ওপর আক্রমণ চালান। কিন্তু তাঁদের আক্রমণ ব্যর্থ হয় কারণ ইহুদীরা তীর ধনুক দিয়ে মুসলিম আক্রমণ প্রতিহত করে। তারা রসূলে করিম (সাঃ) ও তাঁর যোদ্ধাদের বিরুদ্ধে নানা কটুক্তি করতে থাকে। রসূলে করিম (সাঃ) বললেন- আগামীকাল আমি এমন একজনের হাতে যুদ্ধের পতাকা তুলে দেব যে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলকে ভালবাসে, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলও তাকে ভালবাসেন।

কতিপয় সাহাবী ভেবেছিলেন এ পতাকা তাঁদের হাতেই দেয়া হবে। কিন্তু এ পতাকা দেয়া হয়েছিল হযরত জাফরের ভাই হযরত আলী (রাদ্বিঃ)কে। তিনি দৃঢ় হাতে পতাকা হাতে একের পর এক ইহুদী ঘাঁটি জয় করে চললেন। আমাদের আকা রসূলে মকবুল (সাঃ) ও তাঁর সাথীরা এ বিজয়ে অত্যন্ত আনন্দিত হন। ইতোমধ্যে হযরত জাফর (রাদ্বিঃ)-এর নেতৃত্বে হাবশা মুহাজির বাহিনী তথায় উপস্থিত হন। এতে রাসূল করিম (সাঃ)-এর খুশি দ্বিগুণ বৃদ্ধি পায়। তিনি হাসিমুখে বলেনঃ আমি জানিনা কোন ঘটনাটি বেশি আনন্দদায়ক, জাফরের আগমণ নাকি খাইবরের বিজয়!

আল্লাহ্র রসূল (সাঃ) তাঁর চাচাত ভাই জাফরের সাথে কোলাকুলি করেন ও তাঁর কপালে চুমু খান এবং বলেনঃ নিশ্চয়ই জাফর ও তার সঙ্গীরা দুবার হিজরত করেছে একবার হাবশায় দ্বিতীয়বার মদিনা মুনাওয়ারায়।

মুতার যুদ্ধ

আমাদের মহান নবী (সাঃ) শাম দেশের অন্তর্গত বসরা নগরীর শাসনকর্তার কাছে এক দূত পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু দূতটিকে বন্দী করা হয় এবং মুতা নামক স্থানে হত্যা করা হয়। এ আচরণ ছিল আন্তর্জাতিক ও মানবিক রীতিনীতির সম্পূর্ণ পরিপন্থি। এ ঘটনায় হুজুর করিম (সাঃ) যরাপরনাই দুঃখিত হন। তাই তিনি হত্যাকারীদের শায়েস্তা করার উদ্দেশ্যে মুসলমানদের যুদ্ধাভিযানের নির্দেশ দেন। হিজরি ২য় বর্ষের জমাদিউল উলা মাসে তিন হাজার যোদ্ধার একটা দল যুদ্ধ প্রস্তুতি গ্রহণ করে। এ ক্ষেত্রে রসূলে করিম (সাঃ) এঁর উপদেশবাণী মুসলমানদের জন্য আলোকবর্তিকা রূপে কাজ করে। তিনি বলেনঃ আল্লাহ্কে ভয় করবে। আল্লাহ্র নামে অভিযান শুরু করবে। আল্লাহ্র শত্রু ও তোমাদের শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। তোমরা নির্জন গুহায় প্রার্থনারত নিঃসঙ্গ লোকদের দেখতে পাবে। তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না। কোন গাছপালা নষ্ট করবে না। কোন বাড়িঘর ভাঙবে না।

রসূলে করিম (সাঃ) জায়েদ ইবনে হারিসকে মুসলিম বাহিনীর সেনাপতি নিযুক্ত করেন। জায়েদ যদি শহীদ হয় তাহলে সেনাপতির দায়িত্ব নেবে জাফর বিন আবু তালিব। জাফর শহীদ হয়ে গেলে আবদুল্লাহ্ বিন রাওয়াহা তাদের নেতা হবেন।

মুসলমানদের অভিযানের কথা রোমানদের গোচরীভূত হয়। তাই তারাও এক সেনাবাহিনী মোতায়েন করে। এ বাহিনীতে রোমানরা ছাড়াও আরব গোত্রের লোক ছিল। এদের সৈন্য সংখ্যা ছিল দু'লাখ। আল বালকার নিকটবর্তী মাশারিফ গ্রামে প্রথম সংঘর্ষ শুরু হয়। যুদ্ধে রোমান সৈন্যদের নৈপুন্য প্রদর্শিত হয়। কারণ তাদের সংখ্যা ছিল বিপুল। রোমান সম্রাট হিরাক্লিয়াস তাঁর ভাই থিউডরকে যুদ্ধের সর্বাধিনায়ক নিযুক্ত করেন। মুসলিম বাহিনীতে সৈন্য সংখ্যা কম হলেও

তারা মুতার মাঠকে যুদ্ধের ময়দান হিসেবে বেছে নেয়। কারণ স্থানটি কিছুটা উঁচু। এখান থেকে রোমান বাহিনী হতে আত্মরক্ষাও সহজ। জায়েদ বিন হারিস যুদ্ধ শুরুর প্রস্তুতি নেন। তিনি দৃঢ় হস্তে পতাকা হাতে শত্রুবাহিনীর ভেতর ঢুকে পড়েন। এতে অনুপ্রাণিত হয়ে মুসলিম বাহিনী যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়। শত্রুর বর্শার আঘাতে জায়েদের শরীর জর্জরিত হয়ে পড়ে। তিনি ভূমিতে পড়ে যান। মাটি তাঁর বুকের রক্তে রঞ্জিত হয়ে যায়। ফলে তাঁর হাত থেকে পতাকা পড়ে যায়। জাফর বিন আবি তালিব দ্রুত এসে পতাকা হাতে নেন। তিনি তীব্র আক্রমণ শুরু করেন। তিনি সৈন্যদেরকে বিজয়ী অথবা শহীদ হওয়ার জন্য উদাত্ত আহ্বান জানান। প্রত্যেক মুসলমানের অভিলাষ হচ্ছে যুদ্ধের মাঠে শহীদ অথবা গাজী হবার। জাফর ঘোড়া থেকে অবতরণ করে হাতাহাতি যুদ্ধ শুরু করেন। এ বিষয়ে ইসলামের ইতিহাসে তিনিই প্রথম এমন নজির স্থাপন করেন। শত্রুর সামনে তিনি ছিলেন পাহাড়ের মত অনড়। ক্রমাগত শত্রুর আঘাত প্রতিহত করে যাচ্ছিলেন তিনি। যুদ্ধের মাঠে তাঁর দৃঢ়তা শত্রুর মনে বিস্ময় সৃষ্টি করে। তাই তারাও তাঁর বিরুদ্ধে জোর প্রতিরোধ গড়ে তোলে। তাঁর ডান বাহুতে তরবারির আঘাত লাগে। এতে তাঁর ডান বাহু উড়ে যায়। তিনি বাম হাতে পতাকা তুলে ধরেন। এরপর তাঁর বাম বাহুতে আঘাত লাগে। তিনি খণ্ডিত দু'বাহু দিয়ে বুকের সাথে যুদ্ধের পতাকা সমুন্নত রাখেন। এমন ভয়াবহ মুহূর্তে তাঁর গায়ে শত্রুর তরবারির প্রবল আঘাত লাগে। তিনি মাটিতে পড়ে যান এবং শহীদ হন। এরপর আবদুল্লাহ্ বিন রাওয়াহা এগিয়ে এসে যুদ্ধের পতাকা তুলে ধরেন। যুদ্ধের নতুন সেনাপতি আক্রমণ তীব্র থেকে তীব্রতর করে তোলেন। রোমান সৈন্যরা এগিয়ে আসছিল সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো। আবদুল্লাহ্ও মাটিতে পড়ে যান এবং শহীদ হন। এরপর সাবিত বিন আল আরকাম পতাকা তুলে নেন এবং মুসলমানদেরকে একজন নূতন নেতা নির্বাচনের আহ্বান জানান। মুসলমানরা খালিদ বিন ওয়ালিদকে তাঁদের নতুন সেনাপতি নির্বাচিত করেন। নূতন সেনাপতি যুদ্ধের মাঠ থেকে সৈন্য প্রত্যাহার করার সিদ্ধান্ত নেন। শত্রুদের চোখে ধূলা দেয়ার জন্য তিনি কিছু কৌশলগত পন্থা অবলম্বন করেন। রাতের অন্ধকার নেমে এলে মুসলিম বাহিনী মরুভূমির মাঝ বরাবর ফিরে আসে। সকাল বেলা মুসলিম বাহিনীর প্রত্যাহারের খবর পেয়ে রোমান বাহিনী বিস্ময়বোধ করে। তারা মরুভূমির দিকে অগ্রসর হতে সাহস করেনি। মুসলিম বাহিনী সংখ্যায় কম হলেও তারা শত্রুদের বিভ্রান্ত করতে সমর্থ হয়। ফলে রোমানরা ফিরে যেতে বাধ্য হয়।

মদীনায়

যুদ্ধের খবর নিয়ে হযরত জিবরীল (আঃ) মদীনায় অবতরণ করেন। এরপর নবী করিম (সাঃ) মিম্বরে আরোহন করে মুসলিমদের উদ্দেশে ভাষণ দেন। তিনি বলেনঃ যায়েদ যুদ্ধের পতাকা বহন করছিল নিহত না হওয়া পর্যন্ত সে যুদ্ধ করেছে অতঃপর শহীদ হয়েছে। এরপর জাফর পতাকা তুলে নিয়েছে এবং নিহত না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ করে শহীদ হয়েছে। এরপর আবদুল্লাহ্ পতাকা তুলে নিয়েছে এবং যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হয়েছে।

অতঃপর আল্লাহ্র হাবীব রসূলে করিম (সাঃ) শহীদের স্ত্রী আসমাকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্য তাদের বাড়ি যান। তাঁর ছেলেরা বসা ছিল। তিনি ছেলেদের কপালে চুমু খান এবং তাদেরকে কোলে তুলে নেন। তিনি অশ্রু বিসর্জন করতে থাকেন। আসমা বুঝতে পারেন তাঁর স্বামীর কোন দুর্ঘটনা ঘটেছে। তাই তিনি বলেনঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) জাফর ও তাঁর সাথীদের কী অবস্থা হয়েছে?

হাঁ, তারা শহীদ হয়েছে।

এরপর নবী করিম (সাঃ) তাঁদের বাড়ি হতে ফিরে আসেন। তিনি তাঁর আদরের দুলালী হযরত ফাতিমা আজ্ জোহরা (রাঃ)কে নির্দেশ দেন জাফরের বাড়িতে কিছু খাবার পাঠিয়ে দিতে। কারণ তাঁদের ওপর বিপর্যয় নেমে এসেছে।

দুই ডানার অধিকারী

যুদ্ধের মাঠ থেকে ফিরে এসে মুসলিম সৈন্যরা তাদের পরিবার পরিজনের কাছে জাফরের বীরত্বব্যঞ্জক অভিযান ও অন্যান্য শহীদদের কথা বর্ণনা করেন। একজন বলেনঃ আমরা জাফরের গায়ে তরবারির আশিটি আঘাতের চিহ্ন দেখেছি।

একজন বলেনঃ তাঁর ডান বাহু কাটা যাওয়ার সময় আমি তাঁকে দেখেছি।

অন্যজন বলেনঃ তাঁর বাম বাহু কাটা যাওয়ার সময় আমি তাঁকে দেখেছি। তিনি মাটিতে পড়ে যান। তাঁর ক্ষতস্থান থেকে রক্ত গড়িয়ে পড়ছিল।

রসূলে করিম (সাঃ) বলেনঃ জিবরীল আমাকে বলে গেছেন বেহেশ্তে উড়ে বেড়ানোর জন্য আল্লাহ্তায়ালা তাঁকে দু'টো ডানা দান করেছেন।

সেদিন রাতে জাফরের সন্তানেরা বিছানায় বসা ছিল। তারা তারকাখচিত আকাশের দিকে তাকিয়েছিল। তারা কল্পনার চোখে দেখছিল তাদের পিতা দু'ডানার সাহায্যে ফিরিশ্তাদের সাথে বেহেশ্তে উড়ে বেড়াচ্ছেন।

ঈমান ও আখলাক ঃ পর্ব -০১

● সৈয়দ মুহাম্মদ ফখরুল আবেদীন রায়হান ●

প্রত্যেক মুসলমানের জন্য সর্বোপেক্ষা দুইটি উত্তম নেয়ামত হল- ঈমান ও আখলাক। মুসলিম সম্প্রদায়ের ঈমান ও আখলাক যতদিন সুদৃঢ় ও সমুন্নত ছিল, মুসলমানগণ ছিল দ্বিগিজয়ী বীর ও মানবজাতির জন্য আদর্শ। আর যখনই মুসলিম সম্প্রদায়ের ঈমান ও আখলাক দুর্বল ও নিম্নগামী হতে লাগল, তখনই মুসলমানদের সামগ্রিক অবস্থান নড়বড়ে হতে লাগলো। আজকের সংকটময় বিশ্বে মুসলমানদের ঈমান আখলাক সংরক্ষণ করা বড়ই কষ্টসাধ্য ব্যাপার। চারিদিকে নানা ধরনের মতবাদের ছড়াছড়ি আর মূল্যবোধের অবক্ষয়। তাই আমরা ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক ঈমান ও আখলাকের কিঞ্চিৎ পরিচয় তুলে ধরার চেষ্টা করব। ইন্‌শাআল্লাহ।

প্রত্যেক মুসলমানের ঈমানের মূল ভিত্তি হল কালেমায়ে তাইয়েবা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'। ঈমান এর যে শাখা-প্রশাখা সমূহ রয়েছে তা কালেমায়ে তাইয়েবার উপর ভিত্তি করেই সুশোভিত হয়েছে। কালেমায়ে তাইয়েবার দুটি অংশ- উভয় অংশ বারটি অক্ষর দ্বারা গঠিত। এক- লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আর দুই, মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ। অন্যান্য যেসব শাখা-প্রশাখা সমূহ রয়েছে তার মধ্যে প্রধানতম কয়েকটি হল- আসমানী কিতাব সমূহের উপর বিশ্বাস, ফিরিশ্‌তা কুলের উপর বিশ্বাস, সমস্ত নবী রাসুলগণের উপর বিশ্বাস, তাকদীরের ভাল-মন্দের উপর বিশ্বাস, পরকালের উপর বিশ্বাস, মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের উপর বিশ্বাস।

আল্লাহ্‌তায়ালা পবিত্র কুরআনে সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা দিয়েছেন, "পূর্ব ও পশ্চিমে তোমাদের মুখ ফিরানোতে তোমাদের কোন কল্যাণ নেই। কিন্তু পূণ্য আছে যে, আল্লাহ, আখিরাত, ফিরিশ্‌তাগণ এবং কিতাবসমূহ ও নবীগণের প্রতি ঈমান আনে। আর আল্লাহ্ প্রীতিতে আত্মীয় স্বজন, অনাথ, অভাবগ্রস্ত, পর্যটক, সাহায্য প্রার্থীকে এবং দাস মুক্তির জন্য অর্থ দান করলে, নামায কায়েম করলে, যাকাত আদায় করলে, প্রতিশ্রুতি করে উহা পূর্ণ করলে, অর্থ সংকটে- দুঃখ ক্লেশ ও সংগ্রাম সংকটে ধৈর্য ধারণ করলে, এরাই সত্যপরায়ণ এবং মুত্তাকী।" (সুরা বাকারা, আয়াত -১৭৭) উক্ত আয়াতে করীমাতে খুবই সুন্দরভাবে ঈমান, আখলাক ও ইবাদতের গুরুত্ব ও তাৎপর্য সম্পর্কে বিবৃত হয়েছে।

আর আখলাক অর্থ হল উত্তম চরিত্র, সচ্চরিত্র, সদ্ব্যবহার, সুন্দর চরিত্র প্রভৃতি। এক কথায় সকল ধরনের ভালকাজ হল আখলাখের অন্তর্ভুক্ত। বিদ্বানগণ বলেন উত্তম চরিত্রের ভিত্তি হল- জ্ঞান ও প্রজ্ঞা, বীরত্ব ও সাহসিকতা, ন্যায় ও ইনসাফ এবং পবিত্রতা ও নিষ্কলুষতা। তবে আমাদের সামনে উক্ত চরিত্রের সমুজ্জল দৃষ্টান্ত হয়ে আছেন আমাদের প্রিয় নবী শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনাদর্শ। এ প্রসঙ্গে কুরআনে করীমে আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেন "আর নিশ্চয় আপনি উত্তম চরিত্রের শ্রেষ্ঠতম আসনে অধিষ্ঠিত।" (সূরা কলম, আয়াত-০৪) আল্লাহ পাক কুরআনে পাকে মানুষকে উপদেশ দিয়েছেন এভাবে, "তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ্‌কে ও আখিরাতকে ভয় করে তাদের জন্য রাসুলুল্লাহ্‌র মধ্যে রয়েছে সুন্দরতম আদর্শ।" (সূরা আহযাব, আয়াত-২১) রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন "নিশ্চয়ই আমি উন্নত নৈতিক চরিত্রের বিধানের জন্য প্রেরিত হয়েছি।" এক ব্যক্তি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে বলল, ইয়া রাসুলাল্লাহ্, দ্বীন কী? রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন সুন্দর চরিত্র। লোকটি ডান দিক থেকে আবার প্রশ্ন করল, ইয়া রাসুলাল্লাহ্, দ্বীন কী? তিনি লোকটির দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, তুমি কি জান না দ্বীন কী? দ্বীন হচ্ছে, তুমি কখনও রাগান্বিত হবে না। একদা এক ব্যক্তি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খেদমতে হাজির হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ্, আমাকে কিছু নসীহত করুন। তিনি বললেন, তুমি যেখানে অবস্থান করনা কেন, আল্লাহ্‌র ভয়ে ভীত থাক। লোকটি বলল, আরও নসীহত করুন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন কোন পাপ কাজ করলে তৎক্ষনাৎ কোন সৎকাজ করে নাও, কেননা এ সৎকাজ তোমার পাপ মিটিয়ে দেবে। লোকটি বলল আরও উপদেশ দিন। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, মানুষের প্রতি সদ্ব্যবহার ও উন্নত আচরণ কর। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "কিয়ামতের দিন সবচেয়ে ভারী জিনিস যা মিযানে রাখা হবে, তা আল্লাহ্‌র ভয়, সদ্ব্যবহার ও উন্নত চরিত্র।" হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করিম (দঃ) ইরশাদ করেন 'যার মধ্যে তিনটি গুণ নেই অথবা একটি গুণও নেই, তার আমলের কোন মূল্য

নেই। যথা- ১. আল্লাহ ভীতি, ২. ধৈর্য ও পরিণামদর্শিতা যা তাকে মূর্খতাসুলভ আচরণ থেকে বিরত রাখবে। ৩. সদ্ব্যবহার ও উন্নত চরিত্র, যা দিয়ে সে লোকদের মধ্যে বসবাস করবে। রাসুলে পাক (দঃ) মুমিনের মাপকাঠি বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, "মুমিনের মধ্যে ইমানে পরিপূর্ণ সেই ব্যক্তি, যে তাদের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম চরিত্রবান।" অপর এক হাদীস শরীফে আছে, "তোমাদের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট ব্যক্তি সে-ই, যে চরিত্রে সবার সেরা।" রাসুলে করিম রাউফুর রাহিম (দঃ) ঘোষণা দিয়েছেন "কিয়ামতের দিন আমার সবচেয়ে প্রিয় এবং সবচেয়ে নিকটতম আসনের অধিকারী হবে সেসব লোক যাদের চরিত্র সুন্দর।" এক ব্যক্তি নবী করিম (দঃ) কে সুন্দর ও উন্নত চরিত্র সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি (দঃ) কুরআনের একটি আয়াত তেলাওয়াত করেন যার বাংলা অর্থ হলো- "আর ক্ষমার অভ্যাস গড়ে তোল, সৎ কাজের আদেশ দাও এবং মূর্খ জাহেলদের থেকে দূরে সরে থাক।" অতঃপর রাসুল (দঃ) বললেন "সুন্দর চরিত্র হচ্ছে তোমার সাথে যে সম্পর্ক ছিন্ন করে তুমি তার সাথে সম্পর্ক গড় এবং স্থায়ী রাখ। তোমাকে যে বঞ্চিত করে, তুমি তাকে দান কর, তোমার উপর যে অত্যাচার করে তুমি তাকে ক্ষমা কর।" সুতরাং বুঝা যায় যে, ঈমান ও আখলাকের গুরুত্ব অপরিসীম। আমরা অত্র নিবন্ধে ঈমান ও আখলাকের বিভিন্ন উপাদান ও বিষয়াদি নিয়ে আলোচনার চেষ্টা করব, ইনশাআল্লাহ্। আল্লাহ্ তাঁর হাবীব (দঃ) এর উছিলায় আমাদের ঈমানকে মজবুত করুন এবং আমাদের আখলাককে উন্নততর স্তরে সুশোভিত করুন।

আল্লাহ্ এক ও অদ্বিতীয়ঃ- সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহ্তায়ালার জন্য, যিনি তাঁর পবিত্র সত্তা নিয়ে স্বমহিমায় অস্তিত্ববান এবং যিনি সৃষ্টি করেছেন বলেই সমস্ত বস্তু অস্তিত্ব লাভ করেছে। সমগ্র সৃষ্টিলোকই তাঁর সৃজন ও টিকে থাকার জন্য আল্লাহ্র মুখাপেক্ষী। কিন্তু তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন। নিজের সত্তা, গুণাবলী, কর্মকান্ডে তিনি একক। কোন কিছুতেই তার সাথে কোন অংশীদার নেই। তিনিই একমাত্র উপাস্য। সমস্ত উপাসনার তিনিই একমাত্র যোগ্য। তিনি কারোও জ্ঞানের আয়ত্তাধীন নয়। অবশ্য তাঁর কার্যাবলী দ্বারা সংক্ষেপে গুণাবলীর পরিচয় এবং গুণাবলী দ্বারা তাঁর স্বকীয়তার পরিচয় অর্জন হয়। আল্লাহ্র গুণাবলী আল্লাহ্ নয় ও গুণাবলী আল্লাহ্ হতে পৃথকও নয়। যেমন তিনি অনাদি অনন্তকাল আছেন থাকবেন তেমন তাঁর গুণাবলীও আছে থাকবে। তাঁর গুণাবলী সৃষ্টও নয় আয়ত্তাধীনও নয়। তাঁর জাত ও সিফত ব্যতিত সমস্ত জিনিসই সৃষ্ট। আল্লাহ্র অন্যান্য গুণাবলীর মধ্যে কথা বলাও স্থায়ী এবং তাঁর কালামও সৃষ্ট বস্তু নয়। আল্লাহ্তায়ালার কথা বলা জীবধ্বনি হতে পবিত্র। আর কুরআনে করীমে যা আমরা মুখে পড়ি, কাগজে লিখি তা আল্লাহ্তায়ালার স্থায়ী শব্দহীন বাক্য মাত্র। আল্লাহ্র কথা বলার গুণাবলীর কোন তুলনা নাই। জীবন, শক্তি, ইলম, ইচ্ছা, শ্রবণ করা, দেখা, কথা বলা ও সৃষ্টি করা এই আটটি তাঁর নিজস্ব গুণ। শুধুমাত্র নামের মিল ছাড়া এসব গুলাবলীতে সৃষ্টির সঙ্গে তার অন্য কোন মিল নেই। তিনি সমস্ত জড় বস্তু হতে পবিত্র। তাঁর যাবতীয় কর্মকান্ড ও গুণ তাঁর পবিত্র সত্তার ন্যায় নিরাকার ও নিরপেক্ষ। সৃষ্টি করা ও অস্তিত্ব দান করা ও তাঁর একটি বিশেষ গুণ যা কেবল তাঁর জন্যই নির্দিষ্ট। তিনি কামালিয়ত বা পূর্ণতা ও প্রত্যেক সদগুণের কেন্দ্র। সমস্ত দোষণীয় বস্তু হতে তিনি পবিত্র। সৃষ্টির সমস্ত ভাল মন্দের স্রষ্টা আল্লাহ্। আল্লাহ্র কোন গুণাবলীর সাথে সৃষ্টির গুণাবলী তুলনীয় নয়। তিনি কারোও পিতা নন কিংবা কারোও পুত্রও নন। তাঁর উপর স্ত্রীত্ব, স্বামীত্ব আরোপ করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। জ্ঞানে যা অক্ষম মনে হয় তা হতে তিনি সম্পূর্ণ পবিত্র। তাঁর শক্তি তাঁরই মধ্যে নিহিত। আল্লাহ্তায়ালার জ্ঞান প্রত্যেক সৃষ্টিকে বেষ্টন করে আছে। আল্লাহ্তায়ালা মাখলুকের আংশিক, সামগ্রিক, পরস্পর সামঞ্জস্যশীল ও পরস্পর বিরোধী, সম্ভব-অসম্ভব সম্পর্কে একই সময়ে জ্ঞান রাখেন এবং সৃষ্টির কার কখন কী ঘটবে সৃষ্টির পূর্ব থেকে সব তাঁর জানা। আল্লাহ্তায়ালার জ্ঞান অতীত হিসেবে যেমন অসীম, ঠিক ভবিষ্যতের হিসেবেও অসীম। তাঁর জ্ঞান সর্বদাই অসীম। আল্লাহ্তায়ালার জ্ঞান পরিবর্তনশীল নয়। প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য বিষয় সমূহ তিনি জ্ঞাত আছেন। মৌলিক জ্ঞান তাঁরই বৈশিষ্ট্য। মৌলিক জ্ঞান হল এই যা কেউ কাউকে দান করতে পারে না। উহা আল্লাহ্র জ্ঞান। তিনি প্রত্যেক সৃষ্টির স্রষ্টা। উহা মৌলিক হোক বা উদ্ভূত হোক সমস্তই একই স্রষ্টার সৃজন। প্রকৃতপক্ষে সমস্ত সৃষ্টির উপার্জন ও জীবিকা তাঁরই দেওয়া। সবরকম ভাল-মন্দ আল্লাহ্তায়ালা স্বীয় অনাদি জ্ঞান অনুযায়ী স্থির করে দিয়েছেন। যা হওয়ার ছিল এবং করার ছিল তিনি নিজ জ্ঞান হতে লিখে দিয়েছেন। উহার অর্থ এই নয় যে, তিনি যা লিখে দিয়েছেন তা আমরা করতে বাধ্য, বরং আমরা যা করতাম উহাই তিনি লিখে দিয়েছেন। আল্লাহ্তায়ালা বান্দাকে শক্তি ও ইচ্ছার সুরত দান করেছেন এ বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা আবশ্যক। মহান আল্লাহ্র এ নিয়ম চলে আসছে যে, বান্দা যখন কোন কাজ করার ইচ্ছা করে, তখন আল্লাহ্ সেই কাজটি সৃষ্টি করে

দেন এবং তাকে অস্তিত্বে নিয়ে আসেন। আর এ বাহ্যিক শক্তি ও ইচ্ছার ভিত্তিতেই বান্দাকে কাসেব বা অর্জনকারী বলা হয়। প্রশংসা, নিন্দা, পুরস্কার ও শাস্তি সবই এরই ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়ে থাকে। তবে আল্লাহ্ কুফরী, নাফরমানী ও মন্দকর্মে সন্তুষ্ট নন এবং এর জন্য শাস্তি নির্ধারণ করে দিয়েছেন। পক্ষান্তরে ঈমান, আনুগত্য ও ভালোকর্মে আল্লাহ্ সন্তুষ্ট এবং তার জন্য পুরস্কারের ওয়াদা করেছেন। তাঁর ইচ্ছায় কেউ বাধা দিতে পারে না। তিনি যাকে ইচ্ছা সৎপথ প্রদর্শন করেন যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট হতে দেন। তিনি যাকে ইচ্ছা দান করেন আর যাকে ইচ্ছা নিঃস্ব করেন। তিনিই যা করেন সমস্তই বিচারের সহিত সম্পাদন করেন। তিনি নিজের সৃষ্ট আইনের দ্বারা বাস্তব জগতের সমস্ত কাজকে পরস্পর সম্পূরক করে দিয়েছেন। বস্তুতঃ হুকুম ও তকদীরের বিষয় নিয়ে আলোচনা করা সাধারণ মানুষের জ্ঞানের বাইরে। এই বিষয়ে বাড়াবাড়ি ক্ষতির কারণ। আল্লাহ্তায়ালা আকৃতি, রূপ, সীমা স্থিতিশীলতা নড়াচড়া প্রভৃতি মানবীয় গুণাবলী হতে পবিত্র। আল্লাহ্তায়ালা যেভাবে বর্তমান আছেন সেইখানে মানুষের জ্ঞান পৌঁছা সম্ভবপর নয়। আল্লাহ্তায়ালা কোন বস্তুর মধ্যে প্রবেশ করেন না বা তাঁর মধ্যেও কোন কিছু প্রবেশ করতে পারে না। তিনি তাঁর নিকটে ও সাথে আছেন। নিদ্রা ও তন্দ্রা তাঁকে স্পর্শ করে না । তিনি বিশ্ব জগতের পালনকর্তা। এতে তাঁর কোন ক্লান্তি নেই এবং দুঃখবোধও নেই। তিনি অসীম দয়ালু, মহাপরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল ও পাপ মোচনকারী একমাত্র পালনকর্তা। আল্লাহ্তায়ালার ইচ্ছাতেই সৃষ্টিজগতের দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তি, কথনশক্তি, দাহনশক্তি, প্রভৃতি নির্ভর করে। একমাত্র আল্লাহ্র সার্বভৌমত্বই প্রকৃত ও স্থায়ী। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ পাক ঘোষণা করেন, "যাকে ইচ্ছা তিনি ক্ষমা করেন এবং যাকে ইচ্ছা তিনি শাস্তি দেন এবং আকাশ পাতালের এবং এর মধ্যে যা আছে তার সার্বভৌমত্ব আল্লাহ্রই, আর তাঁরই নিকট ফিরতে হবে।" সুরা মায়িদাহ, আয়াত-১৮) কুরআনে করীমে ইরশাদ হয়েছে, "বল হে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহ্। তুমি যাকে ইচ্ছা রাজ্য দান কর আর যার থেকে ইচ্ছা রাজ্য কেড়ে নাও, যাকে ইচ্ছা সম্মানিত কর আর যাকে ইচ্ছা অপমানিত কর। কল্যাণ তো তোমার হাতেই। তুমি সব বিষয়ে সর্বশক্তিমান। তুমি রাতকে দিনে, আর দিনকে রাতে পরিবর্তন কর এবং মৃত হতে জীবন্তের আবির্ভাব ঘটাও আবার জীবন্ত হতে মৃতের আবির্ভাব ঘটাও। তুমি যাকে ইচ্ছা অপরিমিত রিযিক দান কর। (সুরা আলে ইমরান, আয়াত-২৬, ২৭)

আল্লাহ্ওয়ালাগণ কশফ ও মুশাহাদা দ্বারা যা কিছু জ্ঞাত হন আল্লাহ্র যাত তা থেকেও পবিত্র। আল্লাহ্ওয়ালাগণ আল্লাহ্র দান ইচ্ছাতেই জ্ঞাত হন। তাই অদৃশ্যের উপর ঈমান রাখতে হবে এবং কশফ ও মুশাহাদা দ্বারা যতটুকু জানা যায় তা একটি উপমা ও দৃষ্টান্ত মাত্র। মোটকথা, আমরা এ কথার উপর ঈমান এনেছি যে, আল্লাহ তায়ালা সমুদয় বস্তুকে পরিবেষ্টন করে আছেন এবং সবকিছুই তাঁর নিকটই আছে। তবে, এ নৈকট্য, সঙ্গ ও পরিবেষ্টন এর প্রকৃত অর্থ কী তা আমরা জানি না। অনুরূপভাবে আল্লাহ্তায়ালার আরশে সমাসীন হওয়া, মুমিনের অন্তরে তার সংকুলান হওয়া ও শেষ রাতে পৃথিবী সংলগ্ন আকাশে অবতরণ করণ, আবার আল্লাহ্র জন্য হাত ও চেহারা সাব্যস্ত করা যেমনটি কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত আছে; এগুলোর উপর ঈমান আনয়ন করা অপরিহার্য। কিন্তু এগুলোকে বাহ্যিক ও জাহেরী অর্থে প্রয়োগ করা হবে না এবং এসবের ব্যখ্যার পিছনে পড়াও উচিত হবে না বরং এসবের ব্যাখ্যা আল্লাহ্র উপরই সোপর্দ করে দেওয়া উচিত। যাতে যা সত্য নয় তা সত্য মনে করে বসতে না হয়। কুরআনের কোন আয়াত অস্বীকার করা কুফুরী এবং তার অপব্যাখ্যা করা চরম মূর্খতার নামান্তর। তাছাড়া আল্লাহ্তায়ালার আরেক ধরনের নৈকট্য ও সঙ্গ আছে, উপরোক্ত নৈকট্য ও সঙ্গের সাথে যার নামের মিল ছাড়া আর কোন সম্পর্ক নেই । তা ফিরিশ্তা, নবী, অলী আল্লাহ্রা এ বিশেষ বান্দারাই লাভ করতে পারেন। সাধারণ ঈমানদার এ প্রকার নৈকট্য হতে সম্পূর্ণ বঞ্চিত। এ প্রকার নৈকট্যের সীমাহীন স্তর রয়েছে। কোথাও এর বিরাম নেই। আল্লামা রুমী (রঃ) বলেন, "ভাই, আল্লাহ্র মারেফতের স্তর সীমাহীন, এর কোন স্তরে পৌঁছে থেমে পড়ো না যেন।" আল্লাহ আমাদের তাঁর প্রিয় মাহবুব হযরত গাউসুল আজম মাইজভাণ্ডারী (কঃ) এর উসিলায় তাঁর মারেফাতের পরশ দান করুন। আমিন বেহুরমতে সায়্যিদিল মুরসালিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

তথ্যসূত্রঃ

১. আল কুরআনুল কারীম।
২. আল হাদীস শরীফ।
৩. মা লা বুদ্দা মিনহু।
৪. মুকাশাফাতুল কুলুব।
৫. বাহারে শরীয়ত।
৬. আখলাকুন নবী (দ.)।

মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফ সকল সম্পদায়ের জন্য রহমতস্বরূপ

● মুহাম্মদ আহাদুজ্জামান ●

মহান আল্লাহ্ পাক কুরআনুল কারীমে ইরশাদ করেছেনঃ وما ارسلناك الا رحمة للعلمين অর্থাৎ হে মাহবুব (দঃ)! আমি আপনাকে সমস্ত জাহানে রহমতস্বরূপ প্রেরণ করেছি (আয়াতঃ ১০৭, সূরা আম্বিয়া)। অত্র আয়াত দ্বারা জ্ঞাত হওয়া যায়, রাসূল (দঃ) শুধু মুসলমানদের নয় বরং সকল সম্প্রদায়সহ ভূলোকে যত সৃষ্টি আছে সকলের জন্য রহমতস্বরূপ। রাসূল (দঃ)-এর রহমতের ক্ষমতা অন্যান্য নবীগণের তুলনায় ভূলোকে যদিও এত বিস্তৃত হয়, তাহলে তার উম্মতগণও অন্যান্য নবীগণের উম্মতদের তুলনায় অধিকতর ক্ষমতার অধিকারী হবেন। আর এই ক্ষমতা বা শক্তি নেককার বান্দা বা আউলিয়ায়ে কেরামগণ ঐরূপে লাভে সক্ষম হন, যেরূপে তারা উচ্চ থেকে উচ্চতর বেলায়ত অর্জন করতে সক্ষম হয়। আর অত্র উচ্চ বেলায়তের ক্ষমতাসম্পন্ন আউলিয়ায়ে কেরামগণের ভাণ্ডার হল মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফ। মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফ হল এমন এক দরবার যেখানে প্রতিনিয়ত আল্লাহ্র পক্ষ থেকে হযরাত কেরামের মাধ্যমে রহমত বর্ষিত হয়, যা দরবারে পাক থেকে সৃষ্টির মাঝে বন্টিত হতে থাকে। তাই আল্লাহ্ পাক আউলিয়ায়ে কেরামের অসিলায় নৈকট্য অর্জনের জন্য ইঙ্গিত দিয়ে বলেনঃ

يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون

(আয়াত ঃ ৩৫ সূরা মায়েদা) অত্র দরবার পাকে এমন মহান অলীগণ বিরাজমান, যারা মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিষ্টানসহ সকল সৃষ্টির জন্য কল্যাণস্বরূপ। তাইতো আল্লামা গাজী শেরে বাংলা আল ক্বাদেরী (রাঃ) মাখযানে কাশফ ও কারামত, গাউসুল আযম হযরত মাওলানা আহমদ উল্লাহ্ আল মাইজভাণ্ডারী (কঃ)-এর দরবার প্রসঙ্গে "দেওয়ান-ই-আযীম"-এ বলেছেন: [illegible]

বিশ্লেষণমূলক অর্থ হল- তিনি পূর্বাঞ্চলে বিকশিত গাউসুল আযম, তাঁর মাযার শরীফ থেকে কল্যাণপ্রাপ্ত হয় জিন, পরী ও মানব তথা সকল সম্প্রদায়।

এজন্যে দরবার শরীফে যা চাওয়া হয়, পাওয়া যায়। কারণ এই দরবার রাসূল (দঃ)-এর দরবারের সাথে একই বাঁধনে বাঁধা। রাসূল (দঃ)-এর দরবার দুনিয়ার সকল সৃষ্টির জন্য রহমতের ভাণ্ডারস্বরূপ। তেমনি মাইজভাণ্ডার সকল সৃষ্টির জন্য রহমতের ভাণ্ডারস্বরূপ। তাই বিশ্বঅলি শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ)-এর বাণী:

"মাইজভাণ্ডার শরীফ - হায়াতের ভাণ্ডার, রিজিকের ভাণ্ডার, দৌলতের ভাণ্ডার, ইজ্জতের ভাণ্ডার।"

তাই অত্র দরবারে হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান, জিন-পরীদের পদচারণায় সবসময় ভরপুর থাকে। একদিন জৈনপুর নিবাসী পীরে তরিকৃত হযরত মৌলানা কেরামত আলী সাহেবের বংশধর পীর শাহাবুদ্দিন সাহেব হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (কঃ)কে বলেছিলেন, "হুজুর! আপনার দরবারে বহু 'মসরবের' মানুষ দেখছি।" হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (কঃ) বলেনঃ "মিঞা! যিহ্ দোকান মে হারচিজ হ্যায় ওহি আচ্ছা হ্যায়।"

(গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর 'জীবনী ও কেরামত' - সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী)

এই পবিত্র বাণী দ্বারা বুঝা যায়, যে স্থানে সব ধরণের রহমতের ভাণ্ডার বর্তমান, ঐ স্থানে সব ধরণের রহমত পাওয়ার ইচ্ছুক সৃষ্টিসমূহের আগমন বা পদচারণা স্বাভাবিক। এর মাধ্যমে মুসলমানগণ তাদের ইমানকে মজবুত করে। অন্যদিকে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা হযরতে কেরামগণের কেরামতে মুগ্ধ হয়ে ইসলাম গ্রহণের দিকে ঝুঁকে পড়ে। এক্ষেত্রে বলা যায়, মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফ রাসূল (দঃ)-এর দরবারের অনুকরণীয় উপমা। কেননা রাসূল (দঃ)-এর কাছে অনেক ইহুদী-

নাসারা এসে তাঁর মু'জিযায় মুগ্ধ হয়ে ইসলাম গ্রহণ করত। ইমাম জালাল উদ্দীন সুয়ূতী (রহঃ) তাঁর খাসায়েসুল কুব্রা গ্রন্থে বাবু ইজতিমাউল ইয়াহুদ বিন্নাবী (দ.) -এ বর্ণনা করেনঃ

أخرج سعيد بن منصور وأبو يعلى وابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردوية والبزار والحاكم والبيهقي وأبو نعيم - عن جابر بن عبد الله قال أتى النبي ﷺ يهودي فقال يا محمد أخبرني عن النجوم التي رآها يوسف ساجدة له - ما اسماؤها - فلم يجبه بشئ - فنزل عليه جبريل فأخبره - فبعث الى اليهودي فلما جاءه - قال أسلم ان اخبرتك؟ فقال نعم قال حرثان - وكارق الطارق والكتفان وذوا الفرع ووثاب وعمودان وقابس والضروح والمصبح والفيلق والضياء والنور رآها في افق السماء ساجدة له فقال اليهودي هذه والله أسماؤها

(পৃষ্ঠা ঃ ৩১৮, আরবী)

অর্থাৎ, হযরত সাইদ বিন মানছুর, আবু ইয়ালা, ইবনে জরীর, ইবনে আবী হাতেম, ইবনে মরদুইয়া, বাজ্জার, হাকেম, বায়হাকী এবং আবু নাইম (রাঃ) হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, এক ইহুদী রাসূল (দঃ)-এর খেদমতে এসে বললঃ হে মুহাম্মদ! আপনি আমাকে ঐসব তারকারাজির নাম বলুন, যেগুলো হযরত ইউসুফ (আঃ)কে সিজদা করেছিল। এরপর জিবরাঈল (আঃ) এসে তাকে ঐ তারকারাজি সম্পর্কে অবহিত করেন। তখন রাসূল (দঃ) নিজেই লোক পাঠিয়ে ইহুদীকে ডেকে এনে বললেনঃ যদি আমি তোমাকে ঐ তারকারাজির নাম বলি তবে কি তুমি মুসলিম হবে? ইহুদী বললঃ হ্যাঁ। তখন তিনি বললেনঃ এগুলোর নাম হল- হারসান, তারেক, যিয়াল, কেন্আন, যুলফারা, উসাব, উমুদান, কাবেস, দুরুহ, মাসীহ, ফলিক, ঝিয়া ও নূর। হযরত ইউসুফ (আঃ) আসমানের দিগন্তে ঐ তারকারাজি তাকে সিজদা করতে দেখেছেন। এ কথা শুনে ইহুদী বলল ঃ খোদার শপথ! ঐ তারকারাজির নাম এগুলোই।

এভাবে রাসূল (দঃ)-এর বিভিন্ন মু'জিযা দেখে ইহুদী খ্রিষ্টানরা ইসলামে দীক্ষিত হত। অনুরূপভাবে মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফে অনেক হিন্দু-বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান আগমন করে ইসলাম ধর্মে ঝুঁকে পড়ত। ঐরূপ কিছু কিছু ঘটনা হযরত কেবলার জীবনেও ঘটে। হযরত কেবলা তাদেরকে হাকীকিভাবে ইসলামে দীক্ষিত করাতেন। যেমনঃ নিশ্চিন্তাপুর নিবাসী বৌদ্ধ ধনঞ্জয়, হিন্দু অভয়চরণ চৌধুরী সহ অনেকে। যাদের বর্ণনা বিভিন্ন গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে।

অতএব বলা যায়, মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফ সকল সম্প্রদায়সহ সব সৃষ্টির জন্য রহমতস্বরূপ।

গার্মেন্টের ভাবমূর্তি ও আমাদের করণীয়

● অধ্যাপক এ ওয়াই এম জাফর ●

ইদানিং পত্রিকা খুলতেই খোলা কলমের দিকে দৃষ্টি যায়, লীড নিউজ গুলো দেখেই। ২০০৬ সালে সম্পাদক সাহেব আমেরিকা গিয়েছিলেন স্টেট ডিপার্টমেন্টের কর্মসূচীতে। সেখান থেকে তাঁর সন্তানের জন্য একটি শার্ট কিনে এনেছিলেন। তা দেখে তাঁর স্ত্রী বলেছিলেন 'মেড ইন বাংলাদেশ? আমেরিকা থেকে বাংলাদেশী তৈরী শার্ট কিনে এনেছো? এ বছরও তিনি আমেরিকা গিয়েছিলেন, বড় বড় শপগুলোতে বাংলাদেশী তৈরী পোষাক দেখে এসেছেন। বিশ্ব বাজারে বাংলাদেশের অবস্থান দেখে প্রচন্ড তৃপ্তিতে তাঁর মন ভরে গিয়েছিল।

কিন্তু রাতে একটি 'টক্ শো'তে যখন শুনলাম আমেরিকার বড় বড় শপিংমেলের এন্ট্রিতে প্ল্যাকার্ড টাঙিয়ে লিখে রেখেছে 'নো বাংলাদেশি প্রোডাক্ট' মনটা বিষিয়ে উঠলো। না মধ্যরাতের 'টক্ শো' নয়! রাত দশটার 'টক্ শো' কোন তুলনায়ই অবিশ্বাস করার জো নেই। বড় বড় যারা, দেশ নিয়ে চিন্তা করেন বা দেশ চালান তাঁদেরকে বটেই আমরা যারা সাধারণ মানুষ আমাদেরকে চরমভাবে হতাশ করেছে ভাবিয়ে তুলেছে এ ছোট একটি কথা।

রানা প্লাজা ধ্বসের পর বিশ্ববাজারে গার্মেন্টের অবস্থান কোথায় গিয়ে দাড়িয়েছে তারই জ্বলন্ত প্রমাণ এ একটি বাক্য। মূলতঃ রানা প্লাজা ধ্বস শুধুমাত্র একটি ভবনধ্বস নয়, ১১২৭ জন শ্রমিকের হৃদয় বিদারক করুণ নিষ্ঠুর মৃত্যু নয়, মানবিক মূল্যবোধের মৃত্যু, নৈতিকতার মৃত্যু, দায়িত্ববোধ ও কর্তব্যনিষ্ঠার মৃত্যু। অশুদ্ধ রাজনীতি, দলীয় প্রভাবের দুর্বিনীত তেজী স্বভাব, সীমাহীন দুর্নীতি, পরস্বার্থ হরণের মহোৎসব চলছে সর্বত্র। সংশ্লিষ্ট সকল বিভাগীয় কর্মচারী কর্মকর্তাদের জোগসাজশে ৪ তলার অনুমতি প্রাপ্ত এ নয় তলা ভবন এবং গার্মেন্ট মালিকদের সীমাহীন লোভ, অমানবিক দৃষ্টিভঙ্গি ও অবিবেচক মনোভাবের করুণ পরিনতি এ অনাকাঙ্ক্ষিত মৃত্যু যা গোটা সেক্টরকে করেছে প্রশ্নবিদ্ধ মালিকদের বানিয়েছে রক্তচোষায়।

সবচাইতে করুন অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে শ্রমিক মালিক সম্পর্কে। শ্রমিকরা কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছেনা মালিকদের। এ যেন হাসপাতালে বিনা চিকিৎসায় মারা যাওয়া বা ভুল চিকিৎসায় মারা যাওয়া নিকট আত্মীয়ের মৃত্যুর পর দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য মানুষ যেমন ভাঙচুর মারামারি শুরু করে ঠিক তেমন। কিন্তু তাওতো একসময় শেষ হয় সবকিছুর একটা সুরাহা হয়। এর যেন কোন শেষ নেই ইতি নেই। আজ প্রায় তিন মাস হতে চললো কিছুতেই সাভার আশুলিয়ার কোন গার্মেন্ট চালু করতে পারছেনা ঠিকভাবে - শ্রমিক অসন্তোষ, মারামারি, রাস্তা অবরোধ, কর্মকর্তা কর্মচারীদের উপর আক্রমণ, এমনকি মালিকের উপর চড়াও হওয়ার কারণে বিজিএমইএ'র নির্দেশে ৮/১০ দিন পর পর ইতিমধ্যে চেষ্টা চালানো হলেও অসন্তোষের কারণে তা কার্যকর করা কতটুকু সম্ভব হয়েছে? কিন্তু জ্বালাও পোড়াওয়ে অংশগ্রহণকারী শ্রমিকদের মারমুখো ভঙ্গি ও চোখের ভাষার সাথে সাধারণ শ্রমিক যারা ফ্যাক্টরীকে পেছনে ফেলে বাধ্য হয়ে ফ্যাক্টরী থেকে বেরিয়ে আসে তাদের চোখের ভাষা ও ভঙ্গি এক নয় - ভিন্ন। এ ব্যাপারে মালিকদের অভিমত আমাদের শ্রমিকদের আমরা চিনি, তাদের মনোভাব আমরা বুঝি তাদের ভাবভঙ্গি আমরা পড়তে পারি - তারা কিছুতেই তাদের হাতে গড়া ফ্যাক্টরী, দৈনিক সালাম করে যে মেশিন চালু করে সে মেশিন ভাঙতে পারে না, আগুন দিতে পারে না - তাঁদের মতে এটা একটা অপতৎপরতা, কোন দুরভিসন্ধির বহিঃপ্রকাশ বা কারো দাবার গুটি হয়ে শ্রমিকদের লেবাসে দুস্কৃতিকারীদের অপতৎপরতা।

অবশ্য তাঁদের মতে এ জ্বালাও পোড়াও নতুন কিছু নয়। গত ১০/১২ বছর ধরে এ দেশে হর হামেশাই ঘটছে। ঘটছে এমন এমন কারখানায়ও যে কারখানায় বেতন ভাতার কোন সমস্যা নেই, বোনাসের সমস্যা নেই কাজের পরিবেশ ভালো কিন্তু শ্রমিক বেশি। তাই সে সমস্ত ফ্যাক্টরীর শ্রমিককে বের করতে পারলে অন্য ফ্যাক্টরীর শ্রমিককে বের করে আনা সহজ, তাই ঘটছে। অথবা ফ্যাক্টরী কর্তৃপক্ষ এমন কাউকে নাখোশ করেছেন যাকে তিনি চিনতে ভুল করেছেন। যে 'টক্ শো' সম্পর্কে আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ করেছি, সেখানেও এক গার্মেন্ট শ্রমিক নেত্রী 'গার্মেন্টের বর্তমান শ্রমিক অসন্তোষ' ব্যাখ্যায় উপরোক্ত সন্দেহ প্রকাশ করেছেন।

তাই একদিকে ভাবমূর্তি সঙ্কট, অপরদিকে ১০/১২ বছর পূর্ব থেকে শুরু হওয়া এ অঘটন ঘটা, তার উপর রানা প্লাজা ধ্বংসের মতো 'ম্যান মেইড ডিজাস্টার'। সব সমস্যারই ইতি টানা যায়, সেই শ্রমিক নেত্রীর মতে যদি সরকার আন্তরিক ও নিরপেক্ষ হয়ে এর সমাধান চান। তাঁর মতে সব এরিয়ায় এ সমস্যা হয় না। কিছু কিছু এরিয়ায় সমস্যা হয়। কেন হয় তা খুঁজে বের করা সরকারের পক্ষেই সম্ভব। যদি মালিকের

কারণে সে সমস্ত যায়গায় অসন্তোষ হয় বা শ্রমিকের কারণে হয়, অথবা অন্য কোন কারণে হয়, তা খুঁজে বের করে যথোপযুক্ত আইনের আওতায় এনে প্রকৃষ্ট শাস্তির ব্যবস্থা করলে সে সমস্যার সমাধান হবে, ঘটনার পুনরাবৃত্তিও হবে না।

বর্তমান সরকার শ্রমিক বান্ধব সরকার। এ সমস্যা সমাধান সরকারের জন্য কঠিন কোন কাজ নয় বরঞ্চ অত্যন্ত সহজ। শুনছি শীঘ্রই গার্মেন্ট শ্রমিকদের মজুরী নির্ধারণের জন্য 'ওয়েজ বোর্ড' ত্রিপক্ষীয় আলোচনায় একটা মজুরী কাঠামো নির্ধারণ করবে। এ সরকার এবার ক্ষমতায় আসার পর বছর না ফিরতেই আর একটা মজুরী কাঠামো উপহার দেয় ৩ বছর আগে - কথা ছিল ৩ বছর পর তা পুনরায় নির্ধারিত হবে। সরকার তার কথা রেখেছে। ৩ বছর গত হতে না হতে ২য় বারের মতো মজুরী নির্ধারন করছে। বিজিএমইএ'ও সরকারকে সব ধরণের সহযোগিতা করছে।

এরপরও সাভার আশুলিয়ায় কেন শ্রমিক অসন্তোষ তা বোধের অগম্য। বিশেষ করে বড় বড় শিল্প কারখানাগুলোতে এর ব্যাপকতা ওয়াকেবহাল মহলকে ভাবিয়ে তুলেছে। অভিজ্ঞমহলের ধারণা এ নতুন মজুরী কাঠামো নিশ্চয় এ অসন্তোষের আগুনকে নেভাতে সক্ষম হবে। কিন্তু সেই নারী নেত্রীর অভিমত - নতুন মজুরী কাঠামো চালু করে কী হবে। বেতন বাড়ার সাথে সাথে সমস্ত কিছুর দাম বেড়ে যাবে, বেড়ে যাবে ঘর ভাড়া, নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের মূল্য, বেড়ে যাবে ওষুধ, গাড়িভাড়া থেকে সবকিছুর মূল্য। আমরা যেই তিমিরে সেই তিমিরেই থাকবো যদি না সরকার জিনিষপত্রের মূল্য নিয়ন্ত্রণ করেন, সরকারী অফিস আদালতকে কার্যকর ও সক্রিয় করেন, আইনের শাসনকে প্রতিষ্ঠিত করেন। গার্মেন্ট শিল্প অধ্যুষিত এলাকায় শ্রমিকদের থাকার জন্য আবাসস্থল, হাসপাতাল ও স্কুল নির্মাণ করেন, রেশনিং ব্যবস্থা চালু করে চাল, ডাল, তেল, চিনি, আটা, ময়দা নির্ধারিত মূল্যে প্রদান করেন এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় সমস্ত জিনিসের মূল্য নিয়ন্ত্রণে রাখেন। বিজিএমইএ'র সভাপতি তাঁর বাজেট ভাবনায় উপরোক্ত বিষয়াদির দিকে দৃষ্টি দিতে সরকারের প্রতি অনুরোধ জানিয়েছিলেন। তাছাড়াও তিনি কারখানা সমূহে ঝুঁকিমুক্ত, নিরাপদ ও পরিবেশ বান্ধব করে গড়ে তোলার জন্যে ৫% সুদে ৩০০ কোটি টাকা বরাদ্দের দাবী জানিয়েছিলেন এবং সে প্রেক্ষিতে অগ্নিনির্বাপক ও আধুনিক বিদ্যুতাশ্রয়ী যন্ত্রপাতি আমদানিকে শুল্কমুক্ত রাখারও দাবী উত্থাপন করেছিলেন। তাঁদের বিশ্বাস সরকার সহানুভূতিশীল দৃষ্টি দিয়ে উপরোক্ত বিষয়াদি বিবেচনায় নিয়ে কার্যক্রম গ্রহণ করলে গার্মেন্টের এ সমূহ বিপদ থেকে উদ্ধার করা অসম্ভব হবে না।

বিজিএমইএ'র বরাত দিয়ে সংবাদে প্রকাশ বিজিএমইএ'র সদস্যপদ ছাড়াও কিছু গার্মেন্ট রয়েছে যারা নিয়মিত কাজ করে যাচ্ছে ছোটখাট বায়িং হাউসের মাধ্যমে, তাদের পণ্য বায়িং হাউজের মাধ্যমে বাইরেও যাচ্ছে এবং ঐ সকল পণ্যের গুণগত মান নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। বিজিএমইএ'র প্রাক্তন সহ-সভাপতি সিদ্দিকুর রহমান এর বরাত দিয়ে সংবাদে আরো প্রকাশ - দেশে অনেক গার্মেন্ট গড়ে উঠেছে আবাসিক এলাকার ভবনে, ফ্যাক্টরী করার প্ল্যান মাফিক নয়। যার কারণে সিঁড়িগুলো অপ্রশস্ত, জরুরী বিকল্প সিঁড়ি থাকলেও তা থাকে মালপত্র বা কার্টনে ঠাসা। তদুপরি অনেক ফ্যাক্টরীতে ফায়ার ফাইটিং ইকুইপমেন্ট নেই, ফায়ার এক্সটিংগুইসারও অপ্রতুল, ফায়ার ড্রিলের ব্যবস্থাও নিয়মিত হয় না। তার ওপর ফ্যাক্টরী গেট বন্ধ রাখার ভয়ঙ্কর অভ্যাসটাতো রয়েছেই। দেশের সাড়ে পাঁচ হাজার গার্মেন্ট ফ্যাক্টরীর মধ্যে সরকারের বিশেষ ব্যবস্থায় বিদেশী শিল্প মালিকদের আকর্ষণ করার স্বার্থে প্রতিষ্ঠিত চট্টগ্রাম ঢাকার ইপিজেডের ফ্যাক্টরী বাদ দিয়ে, দেশের ১৫/২০টি গ্রুপের ফ্যাক্টরীগুলো ছাড়া, বাকী ফ্যাক্টরীর বেশিরভাগই নিজস্ব ভবনে নয়, ফ্যাক্টরীর জন্য প্রতিষ্ঠিত ভবনেও নয়। লোড বিয়ারিং ক্যাপাসিটি, মেশিন স্থাপনায় স্পেস ডিসটেন্স এর অভাব, লুজ ইলেকট্রিক অয়্যারিং ও নিয়মিত বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইনে মেইনটেন্যান্সের অভাব ছাড়াও রানা প্লাজার মতো স্থাপনা সমস্যা রয়েছে। এ সমস্ত ফ্যাক্টরীতেই চলছে আমাদের গার্মেন্ট এবং স্থান করে নিয়েছে বিশ্বের ২য় বৃহৎ পোশাক রপ্তানী কারক দেশের সম্মান। স্রষ্টার অপার করুণা। তাঁর মতে বিজিএমইএ সদস্য নয় বিধায় তাদের উপর কর্তৃত্ব খাটেনা। বিজিএমইএ'র উক্ত প্রাক্তন সহ-সভাপতি নিজেদের দোষ কাটাতে চাইলেও বাস্তবে তা সম্ভব নয়। মূলত বিজিএমই কেই সমস্ত দায়দায়িত্ব নিতে হবে। সে সুবাদে তাঁরা একটি নতুন সেল গঠন করতে পারেন। যে সেলে কাজ করবেন যে সমস্ত ফ্যাক্টরীর মালিকরা তাদের ফ্যাক্টরী বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছেন শ্রমিক অসন্তোষ, ব্যাংকের চাপে অথবা স্টকলটের কারণে দিশাহারা হয়ে এবং দুর্বিসহ জীবন-যাপন করে চলেছেন আপন সন্তান-সন্ততি নিয়ে, তাঁদেরকে এ সমস্ত বিষয়ে দেখভাল করার কঠিন দায়িত্ব দেয়া যেতে পারে। যেহেতু তাঁরা গার্মেন্টের প্রতিটি নাড়ী নক্ষত্র সম্যকভাবে অবহিত ও দীর্ঘ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন। তাঁদেরকে দিয়ে ভিজিল্যান্স টিম গঠন করে তাঁদের নিয়ন্ত্রনে গার্মেন্টের স্ট্রাকচারাল ডিজাইন, মেশিনারী স্পেস, বিল্ডিংয়ের টোট্যাল লোড বিয়ারিং ক্যাপাসিটি থেকে শুরু করে পরিবেশ, ঝুঁকির

অবস্থা, শ্রমিকদের বেতনভাতা, ওভারইটাইম, বোনাস প্রদানের নিশ্চয়তা বিধান ইত্যাদি। তাঁরা সেভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হবেন এবং অথরাইজড ও সম্মানিত হবেন। তা হলে আশা করা যায় গার্মেন্টের বর্তমান সমস্যার অনেকটা সুরাহা হবে বিপরীতে তাঁরাও নিজেদেরকে অসহায় ভাববেন না, সক্রিয় ভাববেন, কর্মক্ষম ভাববেন - সেক্টরের জন্য কিছু করছেন, দেশকে দিচ্ছেন ভাববেন।

আজ গার্মেন্ট শিল্প ভয়াবহ দুর্যোগের সম্মুখীন। মূলতঃ সেই ৩৪/৩৫ বছর পূর্বে যখন গার্মেন্ট শিল্প ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠালাভ করেছিল একান্ত নিজস্ব উদ্যোগে রিয়াজ গার্মেন্ট, বস্ত গার্মেন্ট দেশ গার্মেন্টকে সামনে নিয়ে, তাঁদের তৈরী পথ বেয়ে। এমনকি তখন তাদেরকে সাহায্য করার মতো কেউ ছিলো না। ছিলো নিজস্ব কর্মস্পৃহা। মনন, মেধা এবং গার্মেন্টের প্রবাদ পুরুষ সিংহপ্রাণ নূরুল কাদের খানের আনুকূল্যে এবং দেশ গার্মেন্টের অধীনে ৫০/৬০ জনের কোরিয়ার ট্রেনিং। গার্মেন্টের সেই Know how, technique, productivity মার্কেটিংয়ের ফসল আজকের এ 'বিশ্বে অবস্থান'। যা আজ হুমকির সম্মুখীন, ভাবমূর্তি সমস্যায় নিপতিত দারুণভাবে।

একটা কথা গার্মেন্ট নিয়ে বহুলভাবে প্রচলিত। গার্মেন্ট মালিকরা শ্রমিকদের ঠকিয়ে কম বেতন দিয়ে নিজেরা মুনাফার পাহাড় গড়ছেন। আর একের পর এক ইন্ডাস্ট্রি গড়ছেন। অভিজ্ঞ মহলের ধারণা মূলতঃ এদেশে গার্মেন্ট শিল্পের সমৃদ্ধির পেছনে মূল কারণ হলো 'কোয়ালিটি' এবং যথাসময়ে শিপমেন্ট নিশ্চিতকরণ, তার উপর সস্তা শ্রমের প্রশ্নতো রয়েছেই। কিন্তু তাঁদের মতে সস্তা শ্রমই যদি গার্মেন্টের জন্য প্রধান ও প্রথম পূর্বশর্ত হতো তা হলে পৃথিবীর অন্য যে সব দেশেও সস্তাশ্রম রয়েছে তারাও গার্মেন্ট ব্যবসায় সফলতা নিয়ে এসে তাদের দেশকে সমৃদ্ধ করতে পারতো - কিন্তু বাস্তবতাতো তা বলে না। বরঞ্চ এমন এমন দেশ আছে যেখানে শ্রমবাজারও খুব সস্তা নয় কিন্তু গার্মেন্ট শিল্পে দ্রুত উন্নতি করে আবার পেছনে পড়ে গেছে - বায়াররা ফিরে আসতে বাধ্য হচ্ছে কোয়ালিটির কারণে অনিশ্চিত শিপমেন্টের কারণে এবং সে সমস্ত দেশের মধ্যে ভিয়েতনাম প্রধান।

তাছাড়া আর একটা বিস্ময় আমাদের গার্মেন্টে রয়েছে, যেখানে দেশের অন্যান্য শিল্প কারখানায় বছরের পর বছর নয় যুগের পর যুগ পার হলেও তেমন পদোন্নতি বা পদের পরিবর্তন ঘটিয়ে উপরে উঠার সুযোগের অভাব রয়েছে সেখানে গার্মেন্ট সেক্টর তার ব্যতিক্রম। যদি মোটামুটি শিক্ষা থাকে অথবা এস.এস.সি বা সমমান, শিক্ষা থাকে বা থাকে উপরে উঠার সদিচ্ছা, কর্মস্পৃহা এবং কষ্টসহিষ্ণুতা, সহজে বুঝার এবং প্রকাশের শক্তি, Commanding Capacity, তা হলে যে শ্রমিক আজ হেল্পার হিসেবে যোগদান করল, দেখা যায় সে বছর না ঘুরতেই অপারেটর, ২/৩ বছরের মাথায় লাইন সুপারভাইজার, ৪/৫ বছর না ঘুরতেই ফ্লোর ইনচার্জ, ৭/৮ বছর যেতে না যেতেই এসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার পরে পি.এম.। বেতন ২৫ হাজার থেকে লাখের উপরে ফ্যাক্টরীর অবস্থাভেদে। কিন্তু তার সেই উপযুক্ততা নিজেকে গড়তে হয় মেধায়, কর্মস্পৃহায়, ঐকান্তিকতায়, আন্তরিকতায় ও একাগ্রতায়। এ ধরণের ভুরি-ভুরি নজির চট্টগ্রাম ঢাকার গার্মেন্টে রয়েছে। আমার জানা মতে অল্প শিক্ষায় শিক্ষিত নারী-পুরষের এত বিকাশ উত্থান সম্ভাবনা আর কোন সেক্টরে নেই। তাছাড়াও এঁদের অনেকেই পরবর্তীতে এক্সিকিউটিভ ডাইরেক্টর, ডাইরেক্টর এমনকি মালিকও হয়ে থাকেন।

বর্তমানের উপর্যুপরি শ্রমিক অসন্তোষ, কিছুতেই ফ্যাক্টরী চালু করতে না পারা বিশেষ বিশেষ এরিয়ায়, মালিকদের চরমভাবে ভাবিয়ে তুলেছে হতাশ করছে। তাঁদের অনেকের মতে তাদের সন্তানরা এ অবস্থা দেখে, অধিক দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে - এত কষ্টের পর এই অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি, তাদেরকে এ ব্যবসায় আসা থেকে দূরে সরিয়ে রাখবে বলে তারা ধারণা করছেন।

গার্মেন্ট ফ্যাক্টরীগুলোতে প্রায় ৪০ লক্ষ শ্রমিক কাজ করে। তার মধ্যে প্রায় আশি ভাগই নারী। তার উপর বেকোয়ার্ড লিংকেজের ফ্যাক্টরী তথা টেক্সটাইল, ডায়িং, লেবেলিং, প্যাকেজিং, প্রিন্টিংসহ ও অন্যান্য একসেসরিজ সেক্টর মিলিয়ে প্রায় ৭০ লাখ শ্রমিকের কর্মসংস্থান করে চলেছে এ সেক্টর এবং একজন শ্রমিকের পোষ্য যদি কমপক্ষে ৪জন মানুষ হয় তাহলে কত কোটি মানুষের সরাসরি ভরণপোষন করে এ সেক্টরে তা সহজেই অনুমেয়। তার উপর রয়েছে পরোক্ষ অবদান ব্যাঙ্ক, বীমা, হোটেল, মোটেল, মার্কেট, শপিংমল, মাল্টিস্টোরিড ভবন, বাসস্থান, পর্যটন, পরিবহনসহ প্রায় সকল প্রতিষ্ঠানের ফুরফুরে সমৃদ্ধি।

তাই বিদগ্ধজন মনে করেন গার্মেন্ট নিয়ে গভীরভাবে ভাবার সময় এসেছে। সময়ের এক ফোঁড় অসময়ের দশ ফোঁড় কিন্তু গার্মেন্টের জন্য কোনদিনই সুখকর হবে না। এখনই সময় ভাবার পদক্ষেপ নেওয়ার। মনে রাখতে হবে বাংলাদেশে গার্মেন্টের উত্থান শ্রীলঙ্কার রাজনৈতিক অস্থিরতায় বায়ারদের অর্ডার ক্যানসেলেশনের কারণে। আজকে আমরাও কি সে অবস্থার সম্মুখীন নই?

স্মৃতিতে শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ)

প্রায় ৩০ বছর ধরে শাহানশাহ্ হুযুরের সান্নিধ্যে থাকা কাজী করিমুল হুদার স্মৃতিচারণ

'একদিন শাহানশাহ্ হুযুরের সাথে গাড়িযোগে ভ্রমণে ছিলাম। চট্টগ্রাম ফটিকছড়ির নাজিরহাট বাজারে পৌঁছলে হঠাৎ গাড়ি থামাতে বললেন হুযুর। এক জেলে সেখানে রাস্তার পাশে বসে ছোট মাছ বিক্রি করছিল। হুযুর জেলে মাছ বিক্রেতাকে তাঁর কাছে ডেকে এনে বললেন, মাছগুলো আমার গাড়িতে দিয়ে দাও। মাছ ছিল খুব অল্প। আধা কেজির চেয়েও কম। হুযুর বললেন, দাম কত দেবো? খুব অল্প মাছ হওয়ায় জেলে দাম বলতে চাইছিল না। হুযুর মাছ বিক্রেতা দরিদ্র জেলের হাতে তুলে দিলেন ৪ হাজার টাকা। সঙ্গে সঙ্গে জেলে হুযুরের কদমে সেজদায় লুটে পড়ে অতি আনন্দে গড়িয়ে পড়া চোখের পানি মুছতে মুছতে বললেন, 'হুযুর! আজ প্রায় দু'বছর ধরে পরিবার নিয়ে অতি কষ্টে খেয়ে-না খেয়ে আছি। চার হাজার টাকা জোগাড় করতে না পারায় জীবিকার সম্বল হিসেবে একটি জাল কিনতে পারিনি। এই টাকা দিয়ে একটি জাল কিনে মাছ ধরে আমি পরিবার নিয়ে বেঁচে থাকবো' - জেলের মুখে কথাগুলো বলা শেষ না হতেই হুযুর দ্রুত গাড়িযোগে এই স্থান ত্যাগ করে চলে গেলেন। এভাবে অতি দরিদ্র, চরম অভাবী বিপন্ন মানুষ খুঁজে খুঁজে আজীবন অকাতরে দান ও দয়ার হাত প্রসারিত করেছিলেন বিশ্বঅলি শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ)। সর্বধর্মের সর্বশ্রেণীর বিশেষত অসহায় মানুষের প্রতি তাঁর দরদ ও সহানুভূতি ছিল উন্মুক্ত।

জনাব কাজী মুহাম্মদ করিমুল হুদা। বয়স এখন প্রায় ৭৯ বছর। এক সময় চট্টগ্রামে বিদ্যুৎ বিভাগ তথা পিডব্লিউডির ঠিকাদার ছিলেন। বাড়ি নোয়াখালী জেলার রামগঞ্জ উপজেলার ময়মিনপুর। জীবনের বেশিরভাগ সময় কেটেছে তাঁর চট্টগ্রামেই। থাকতেন চট্টগ্রাম মহানগরের ফিরিঙ্গিবাজারে। সেখানেই সরকারি ঠিকাদারির পাশাপাশি কাঠের ব্যবসাও করতেন। ১৯৬৫ বা ১৯৬৭ সন থেকে ১৯৭০ সনের মাঝামাঝি সময়ে শাহানশাহ্ হুযুরের সান্নিধ্যে আসেন কাজী করিমুল হুদা। বয়স বেশি হওয়ায় কোন্ বছরে হুযুরের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাত হয়েছিল তা ঠিকঠাকভাবে বলতে না পারলেও হুযুরের অনেক স্মৃতি ও ঘটনার কথা গড়গড় করে তিনি বলে দিচ্ছিলেন আলাপচারিতায়। সরকারি ঠিকাদারি এবং কাঠের ব্যবসা দুটোই চালিয়ে যাচ্ছিলেন। একদিন শাহানশাহ্ হুযুর তাঁকে বললেন, একটি ব্যবসাই করেন। দুই ব্যবসা ঠিক না। শেষ পর্যন্ত সরকারি ঠিকাদারি ছেড়ে হুযুরের পরামর্শ মতো শুধু কাঠের ব্যবসাই বেছে নিয়েছিলেন। এতেই স্বাচ্ছন্দে ও সচ্ছলতায় তাঁর জীবন কেটে যায়। যে ব্যবসা এখন সন্তানদের হাতে ছেড়ে দিয়ে পরিণত বয়সে এসে ইবাদাত-রিয়াজতেই দিন পার করছেন কাজী করিমুল হুদা। মাসিক আলোকধারার পক্ষে গত ২১ মে ২০১৩ মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৬টা থেকে প্রায় দুই ঘণ্টা সংবাদকর্মী আ ব ম খোরশিদ আলম খানের সাথে নানা স্মৃতিকথা তুলে ধরার নানা মুহূর্তে তিনি কথা থামিয়ে দিচ্ছিলেন এই বলে যে, শাহানশাহ্ হুযুরের কাছ থেকে বহু অলৌকিক বিস্ময়কর ঘটনা তিনি কাছ থেকে দেখেছেন। হুযুরের নিষেধ থাকায় তিনি সব খুলে বলতে বার বার অপারগতা প্রকাশ করছিলেন। তবুও বেশ চমকপ্রদ ভাবোদ্দীপক বিস্ময়ঘেরা নানা তথ্য-স্মৃতিকথা উঠে আসে করিমুল হুদা সাহেবের সাথে আলাপচারিতায়। তাঁর ছেলে কাজী মুহাম্মদ মোশাররফ হোসেন রিপন ও আলোকধারার মুহাম্মদ মেজবাহ উদ্দিন আলাপকালে উপস্থিত ছিলেন। চট্টগ্রাম মহানগরীর এনায়েত বাজার 'বাটালি এপার্টমেন্ট'র বাসায় কাজী করিমুল হুদার সাথে আলাপের আদ্যোপান্ত আলোকধারার পাঠকদের জন্য এখানে তুলে ধরা হলো।

১০ মাঘ প্রধান ওরশ শরিফের দিনে মাগরিবের পরে মাইজভাণ্ডার শরিফে প্রথম গেলেন কাজী করিমুল হুদা। শাহানশাহ্ হুযুর তখন দরবারের পশ্চিম বাড়িতে একটি ঘরে ছিলেন। কারো সাথে তিনি তখন কথা বলতেন না। অন্য হালতে থাকতেন। ওই দিন ওই সময়ে খুব ক্ষুধার্ত ছিলেন করিম সাহেব। কী আশ্চর্য! হঠাৎ করে ভেতরের বাড়িতে ডেকে নিয়ে ক্ষুধার্ত করিম সাহেবকে খানার টেবিলে বসিয়ে ভাত খাওয়ার ব্যবস্থা করে দিলেন শাহানশাহ্ হুযুর।

১৯৬৫-৬৭ থেকে ১৯৭০ সনের কোনো এক সময়ে প্রথমবারের মতো মাইজভাণ্ডার শরিফে গিয়েছিলেন কাজী করিমুল হুদা। ঐদিন তিনি প্রথম দেখেন শাহানশাহ্ হুযুরকে। তখনো আজকের গাউসিয়া হক মনজিল নামে

পৃথক কোনো মন্‌জিল হয়নি। শাহানশাহ্ হুযুর পশ্চিমের বাড়িতে গাউসিয়া আহমদিয়া মন্‌জিলে একটি কাঁচা ঘরে থাকতেন। প্রথম সাক্ষাতের সময় করিম সাহেব হাদিয়া হিসেবে নেওয়া ৪টি কমলা শাহানশাহ্ হুযুরের হাতে তুলে দিলেন। হুযুর তাঁর সঙ্গে কথা বললেন খোশ মেজাজে। ঐ দিন থাকতে বললেন। করিম সাহেবের সঙ্গে শাহানশাহ্ হুযুর যখন কথা বলছিলেন তখন ওখানে শত শত লোক। সবাই খুশিতে হঠাৎ চিৎকার করে উঠলেন। পরে করিম সাহেব জানলেন, এর আগে বহুদিন থেকে শাহানশাহ্ হুযুর কোনো ধরনের কথাবার্তা বলছিলেন না। করিম সাহেবের সাথে হঠাৎ কথা বলার দৃশ্য দেখেই উপস্থিত ভক্ত জনতা খুশিতে চিৎকার করে উঠেছিলেন। কেননা, এমন দৃশ্য আগে দেখা যায় নি। বহুদিন পর এই প্রথম কোনো ভক্তের সাথে কথা বললেন শাহানশাহ্ হুযুর। এজন্যই সবার মাঝে এতো খুশি ও এতো কৌতূহল লক্ষ্য করা গেলো।

শাহানশাহ্ হুযুর দরবারের এক লোককে ডেকে করিম সাহেবকে দেখাশোনা করার এবং তখনই ভাতের ব্যবস্থা করতে নির্দেশ দিলেন। ভেতরে লঙ্গর খানায় তাঁকে ডেকে নিয়ে ভাতের টেবিলে বসিয়ে দেওয়া হলো। খুবই ক্ষুধার্ত করিম সাহেব তৃপ্তিসহকারে খানাপিনা খেলেন। শাহানশাহ্ হুযুর দরবারের লোকটিকে করিম সাহেব রাতে কোথায় ঘুমাবেন তাও ব্যবস্থা করে দিতে বললেন এবং রাত ৩টায় মুনাজাতের সময় করিম সাহেবকে ঘুম থেকে জাগিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। করিম সাহেব কয়েক ঘণ্টা একটি নির্দিষ্ট কক্ষে ঘুমালেন। রাত ৩টার সময় হুযুরের কথা মতো তাঁকে ডেকে দেওয়া হলো এবং তিনি মুনাজাতে শরিক হলেন। পরের দিন সকালে হুযুরের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চট্টগ্রাম শহরের বাসায় ফিরে এলেন কাজী করিমুল হুদা।

মাইজভাণ্ডার শরিফে প্রথমবারের মতো গিয়ে যে সুখকর অভিজ্ঞতা হলো তা এখনো ভুলতে পারেন নি করিম সাহেব। শাহানশাহ্ হুযুরের সঠিক সময়ে মেহমানদারি অর্থাৎ প্রচণ্ড ক্ষুধার্ত অবস্থায় শুধুমাত্র তাঁকে ভেতরের বাড়িতে ডেকে নিয়ে খানা খাওয়ানোর ব্যাপারটি তাঁর কাছে বিরাট রহস্যপূর্ণ মনে হলো। কেননা, তিনি যে ক্ষুধার্ত, তা হুযুরকে বা কাউকে বলেন নি। অথচ হুযুর নিজেই খুব দ্রুততার সাথে করিম সাহেবকে খাওয়ার ব্যবস্থা করে দিলেন। শাহানশাহ্ হুযুর যে মানুষের মনের অবস্থা জানেন ও বুঝেন তা করিম সাহেব বুঝতে পারলেন মাইজভাণ্ডার শরিফে প্রথমবার গমন করেই। এরপর থেকে দরবার, মাইজভাণ্ডারী মহাত্মা, বিশেষত শাহানশাহ্ হুযুরের প্রতি এক আলাদা ভক্তি-শ্রদ্ধাবোধ জন্মায় বলে জানালেন কাজী করিমুল হুদা।

পেটে ক্যান্সার হওয়া সত্ত্বেও প্রায় ৪০ বছর ধরে দিব্যি সুস্থ শরীরে আছেন ঢাকা উয়ারীর সাবেক ফরেস্ট অফিসার কাজী শামসুল হুদার স্ত্রী জাহির বেগম।

কাজী করিমুল হুদার এক বড় ভাইয়ের নাম কাজী মুহাম্মদ শামসুল হুদা। তিনি বন বিভাগের সাবেক পদস্থ কর্মকর্তা ছিলেন। বর্তমানে বেঁচে নেই। কিন্তু শামসুল হুদা মারা গেলেও তাঁর পেটে ক্যান্সার আক্রান্ত স্ত্রী জাহির বেগম প্রায় চল্লিশ বছর ধরে দিব্যি সুস্থ শরীরে দিন কাটাচ্ছেন বলে জানালেন কাজী করিমুল হুদা। বড় ভাইয়ের স্ত্রী তথা ভাবির ক্যান্সার আক্রান্ত হওয়ার ঘটনা বর্ণনা করে করিমুল হুদা সাহেব বললেন, বর্তমান ঢাকার উয়ারীর বাসিন্দা ভাবির পেটের ক্যান্সার ধরা পড়লো। ডাক্তার বললেন, অপারেশন করতে হবে। তাও বাঁচবে এমন নিশ্চয়তা নেই বরং যেকোনো মুহূর্তে মহিলার মৃত্যুর আশংকার কথা জানালেন বিশেষজ্ঞ ডাক্তাররা।

এদিকে চট্টগ্রামে অবস্থান করা কাজী করিমুল হুদাকে ঢাকা থেকে ফোন করে জানানো হলো, তিনি যেন মাইজভাণ্ডার শরিফের হযরত শাহানশাহ্ হুযুরের কাছে তাদের (বড় ভাইয়ের স্ত্রীর) জন্য দোয়া চান। এদিকে ঢাকার এক হাসপাতালে অপারেশনের জন্য নেওয়া হলো ভাবিকে। অন্যদিকে ওই সময় চট্টগ্রাম শহরে ব্যাটারী গলির খানকায় অবস্থান করার খবর পেয়ে শাহানশাহ্ হুযুরের কাছে দোয়া প্রার্থনার জন্য ছুটে গেলেন কাজী করিমুল হুদা। তিনি কেন হুযুরের কাছে গিয়েছেন তখনো কিছু বলেন নি, অথচ তাঁকে দেখা মাত্রই শাহানশাহ্ হুযুর বলে উঠলেন, রোগী তো এখন ঘরে। করিম সাহেব বললেন, না হুযুর, রোগী এখন হাসপাতালে আছে, অপারেশন করা হচ্ছে। হুযুর আবারো জোর দিয়ে বললেন, না - আপনার ভাবি এখন ঘরেই আছে। আপনি খবর নিন। এদিকে হুযুরের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাসায় ফিরে ঢাকায় বড় ভাইয়ের বাসায় ফোন দিলেন করিম সাহেব। তিনি ভাবির অবস্থা জানতে চাইলেন। তাঁকে জানানো হলো, ভাবিকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে সত্য, কিন্তু শরীর চেকআপ করে বিশেষজ্ঞ ডাক্তার বললেন, না-এখনই অপারেশন করা যাবে না। কেন অপারেশনের রোগীকে হঠাৎ করে অপারেশন ছাড়াই হাসপাতাল থেকে

ছাড়পত্র দেওয়া হলো, পরিবারের লোকেরাই বিষয়টি বুঝতে পারলেন না। ওই যে শাহানশাহ্ হুযুর বললেন, 'রোগী তো এখন ঘরে'- তাই সত্য প্রমাণিত হলো। করিম সাহেবের বড়ভাই কাজী শামসুল হুদা প্রায় ৯০ বছর বয়সে চার মাস আগে ইন্তিকাল করেছেন। অথচ প্রায় ৪০ বছর আগে পেটের ক্যান্সার ধরা পড়া সত্ত্বেও এখনো সুস্থ শরীরে বেঁচে আছেন তাঁর স্ত্রী জাহির বেগম (বয়স এখন প্রায় ৭৫ বছর হবে)। পেটের যে স্থানে ক্যান্সার ধরা পড়েছে, ক্ষত স্থানটি ৪০ বছর আগে যেভাবে ছিল এখনো ঠিক সেভাবেই আছে। অথচ অপারেশনের আর প্রয়োজন হয়নি।

ভাবির ওপর শাহানশাহ্ হুযুরের আধ্যাত্মিক করুণা দৃষ্টি আছে বলেই তিনি এতো বছর ধরে সুস্থ ও আরামে আছেন বলে জানালেন দেবর কাজী করিমুল হুদা। দোয়াপ্রার্থী বিপদগ্রস্ত মরণাপন্ন মানুষকে শাহানশাহ্ হুযুর কর্তৃক এভাবে করুণা দৃষ্টি দিয়ে স্বাভাবিক জীবন ফিরিয়ে দেয়ার অসংখ্য দৃষ্টান্ত আছে বলে মন্তব্য করলেন করিম সাহেব।

❑ পরিবার নিয়ে চরম কষ্টে বেঁচে থাকা জেলের কাছ থেকে আধা কেজির চেয়েও কম মাছ কিনে নিয়ে দাম হিসেবে তাঁর হাতে তুলে দিলেন ৪ হাজার টাকা। আনন্দাশ্রু ফেলে জেলে শাহানশাহ্ হুযুরকে বললেন, 'মাত্র ৪ হাজার টাকার জন্য একটি জাল কিনতে না পেরে আমি দু'বছর ধরে পরিবার নিয়ে অতি কষ্টে খেয়ে না খেয়ে বেঁচে আছি। এই টাকা দিয়ে জাল কিনে মাছ ধরে আমি সংসার চালাবো।'

বিশ্বঅলি শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ) সর্বশ্রেণীর সর্বজাতির সর্বধর্মের বিপদগ্রস্ত মানুষ খুঁজে খুঁজে তাদের প্রতি করুণার হাত বাড়িয়ে দিতেন। খোদা প্রদত্ত বিস্ময়কর অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন তিনি। কেউ মুখে কিছু না বলতেই, কিছু না চাইতেই তার সামনে তার মনের গোপন আর্জি প্রকাশ করে ফেলতেন শাহানশাহ্ হুযুর। সারা দেশে বিশেষত বৃহত্তর চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলায় তিনি ভক্তদের নিয়ে হঠাৎ হঠাৎ গাড়িযোগে ভ্রমণে বের হতেন। কোনো এক জায়গায় গিয়ে হঠাৎ করে ড্রাইভারকে বলতেন, গাড়ি থামাও। তারপর দেখা যেতো, রাস্তায় দাঁড়ানো বা রাস্তায় নানা জিনিস পত্র বিক্রি করা কোনো মানুষকে কাছে ডেকে নিয়ে তার কাছ থেকে সামান্য পণ্য বা খাদ্য সামগ্রী কিনে নিয়ে হাজার টাকা এমনকি দশ হাজার টাকা পর্যন্ত ওই দরিদ্র অভাবী বিপদগ্রস্ত লোকটির হাতে গছিয়ে দিতেন। লোকটি কিছু বুঝে উঠার আগেই কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সুযোগ না দিয়ে দ্রুত ওই স্থান ছেড়ে চলে যেতেন অন্য কোথাও। শাহানশাহ্ হুযুরের জীবনে এমন বহু ঘটনা-দৃশ্য বহুজন দেখেছেন। অসহায় মানুষ খুঁজে খুঁজে কিছু কেনার ছুতো ধরে তাদের হাতে হাজার হাজার টাকা তুলে দিয়ে মূলত বড় কোনো সমস্যার সমাধানই করে দিতেন শাহানশাহ্ হুযুর। এমন একদিনের ঘটনা আলাপে খুলে বললেন কাজী করিমুল হুদা।

❑ করিমুল হুদা সাহেবের বড় ছেলে ইকবালকে পাগলা কুকুর কামড়ানোর পর চিকিৎসা ছাড়াই তিনি সুস্থ ছিলেন। অথচ ওই কুকুরের কামড়ে তিনটি ছাগল সঙ্গে সঙ্গে মারা যায়। এক বছর পর ইকবালসহ ৬ ছেলেকে নিয়ে মাইজভাণ্ডার শরীফে শাহানশাহ্ হুযুরের কাছে গেলেন। করিম সাহেবকে সন্তান পরিবেষ্টিত অবস্থায় দেখে হুযুর বললেন, কুকুর কাকে কামড়িয়েছে? নিজে কিছু না বলা সত্ত্বেও হুযুরের মুখে একথা শুনে চমকে গেলেন সবাই।

কাজী করিমুল হুদা সাহেবের বাসা তখন চট্টগ্রাম মহানগরীর ফিরিঙ্গি বাজার। তার ৬ ছেলে ও ৪ মেয়ের মধ্যে বড় ছেলের নাম মুহাম্মদ ইকবাল। বর্তমানে ব্রুনাই দেশে আছেন সপরিবারে। মুহাম্মদ ইকবালকে একদিন বাসার সামনে এক পাগলা কুকুর কামড় দিল। কামড় ছিল গুরুতর। কুকুরটি আরও তিনটি ছাগলকে কামড়ালে তখনই ছাগল ৩টি মারা যায়। ছাগল ৩টির মধ্যে একটি মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফে ১০ মাঘের প্রধান ওরশ শরিফের জন্য এবং অন্য একটি কুতবুল আকতাব হযরত শাহ্সূফি আমানত খান (রহঃ)-এর মাজারে হাদিয়া হিসেবে দেওয়ার জন্য লালন পালন করছিলেন করিম সাহেব। এদিকে কুকুরের কামড়ের বিষে ছাগল দুটি সঙ্গে সঙ্গে মারা গেলেও কুকুরের কামড়ে গুরুতরভাবে আক্রান্ত ইকবালকে কোনো চিকিৎসকের কাছেই নেয়া হয়নি। করিম সাহেব মনে মনে শাহানশাহ্ হুযুরকে স্মরণ করলেন। তাঁর সুদৃঢ় বিশ্বাস ছিল, মাইজভাণ্ডার শরিফের বুযুর্গদের দোয়ায় ও তাঁদের উসিলায় ছেলে ইকবাল চিকিৎসা ছাড়াই ভালো হয়ে যাবে। যেমন ভাবনা তেমনই ফল। দিন, সপ্তাহ, মাস যায় এমনকি ১ বছর পার হয়ে গেল, কুকুরের কামড়ে আক্রান্ত ইকবালের কিছুই হলো না।

এক বছর পর ইকবালসহ ৬ ছেলেকে নিয়ে মাইজভাণ্ডার শরিফে গেলেন বাবা কাজী করিমুল হুদা। ঐ দিন ছিল

মাইজভাণ্ডার শরিফের প্রধান ওরশের দিন ১০ মাঘ। গাউসুল আযম হযরত মাওলানা শাহ্‌সূফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারী (কঃ)-এর ওরশের দিনে মাইজভাণ্ডার শরিফে গিয়ে শাহানশাহ্ হুযুরের সাথে ছেলেদেরকে নিয়ে সাক্ষাৎ করলেন করিম সাহেব। তাঁকে দেখা মাত্রই হুজুর বলে উঠলেন, কুকুর কাকে কামড় দিয়েছে? হুযুরের মুখে আচমকা এ কথা শুনে চমকে গেলেন করিম সাহেব। যেহেতু তিনি তখনো হুযুরকে কিছুই বলেন নি। মাত্র হুযুরের সামনে গিয়েছেন তাঁরা। করিম সাহেব বুঝতে পারলেন, ছেলে ইকবালকে কুকুর কামড়ানোর পর ওই যে তিনি মাইজভাণ্ডার শরিফে বুযুর্গ ও শাহানশাহ্ হুযুরকে স্মরণ করেছিলেন এবং এ ভরসায় ছেলের কোনো চিকিৎসাই করেন নি - মূলত এ কারণেই শাহানশাহ্ হুযুরের শুভ দৃষ্টি তাঁর ছেলে ইকবালের ওপর ছিল। তাই, পাগলা কুকুরের কামড় খেয়েও চিকিৎসা ছাড়াই সুস্থ ছিলেন ইকবাল।

দরবারে উপস্থিত হয়ে কিছু আম হাদিয়া হিসেবে শাহানশাহ্ হুযুরের হাতে তুলে দেন করিম সাহেব। সঙ্গে থাকা ৬ ছেলের মধ্যে ৫ জনকে বসতে বললেন হুযুর। কিন্তু বড় ছেলে মুহাম্মদ ইকবালকে বসতে নিষেধ করলেন। শুধু তাই নয়, ইকবালকে খুব মারধর করলেন শাহানশাহ্ হুযুর। এমনকি প্রহারে তাঁর মাথাও ফেটে যায়। ছেলের এ দৃশ্য দেখে বিচলিত হলেন করিমুল হুদা। ভাবলেন, ছেলেকে ডাক্তারের কাছে নেবেন। কিন্তু হুযুর নিজ থেকেই নিষেধ করে জানালেন, না ডাক্তার দেখাতে হবে না। এমনিতেই ভালো হয়ে যাবে। ওইদিন রাতে মাইজভাণ্ডার শরিফে অবস্থান করে পরের দিন সকালে তাঁরা ফিরে এলেন চট্টগ্রাম মহানগরীর ফিরিঙ্গি বাজারের বাসায়। সত্যি সত্যি ছেলে ইকবাল চিকিৎসা ছাড়াই দু'একদিনের মধ্যে সুস্থ হয়ে গেলো। শাহানশাহ্ হুযুর দ্বারা মার খাওয়া ও মাথা ফেটে যাওয়া ইকবাল হুযুরের কথামতো চিকিৎসা ব্যতীত ভালো হয়ে যাওয়া - করিম সাহেবের কাছে এই ব্যাপারটিও বেশ রহস্যজনক মনে হলো। এক বছর আগে কুকুরের কামড়ে আক্রান্ত ও পরে মাইজভাণ্ডার শরিফে গিয়ে শাহানশাহ্ হুযুরের হাতে রহস্যজনকভাবে মার খেয়ে দরবার শরিফ থেকেই কোথাও উধাও হয়ে যান ইকবাল। পরে একমাস পর হঠাৎ বাসায় এসে মা-বাবা-ভাই-বোন সকলের কাছ থেকে বিদায় চেয়ে ইকবাল জানালেন, তাঁর ব্রুনাইয়ের ভিসা কনফার্ম হয়েছে। দু'একদিনের মধ্যে তিনি সেই দেশের উদ্দেশে বাংলাদেশ ত্যাগ করবেন। সেই সময় থেকে আজ প্রায় ৩০ বছর ধরে ব্রুনাইয়ে আছেন মুহাম্মদ ইকবাল। সেই দেশের নাগরিকত্ব নিয়েছেন, সেখানে বিয়ে করেছেন এবং সেই দেশে তিনি এখন প্রতিষ্ঠিত বলে জানালেন বাবা কাজী করিমুল হুদা।

ভক্ত-জনতাকে খুবই মেহমানদারি করতেন এবং সবার খোঁজখবর নিতেন শাহানশাহ্ হুযুর

ছেলেদের নিয়ে মাইজভাণ্ডার শরিফে পরের বছর ১০ মাঘ ওরশ শরিফে আবারও গেলেন কাজী করিমুল হুদা। দরবারে শাহানশাহ্ হুযুর তাঁদের দেখে 'তৌহিদ মামা' নামে খ্যাত এক লোককে নির্দেশ দিলেন, করিম সাহেবদের দেখাশোনা ও খানাপিনার ব্যবস্থা করতে। তাঁদের কষ্ট হবে এই বলে গভীর রাত হওয়ার আগেই তবরুক খাইয়ে ও কিছু তবরুক সঙ্গে দেওয়ার জন্য নির্দেশ দিলেন তৌহিদ মামাকে। একটি মাটির পাতিলে তবরুক দেওয়া হলো। করিম সাহেব যখনই দরবারে যেতেন, চট্টগ্রাম শহর থেকে রিজার্ভ ট্যাক্সি নিয়ে রওয়ানা হতেন। তবরুক তাঁদের সামনে আনার পর শাহানশাহ্ হুযুর এবার ইউসুফ পাগলা নামে পরিচিত এক মজজুব ব্যক্তিকে বললেন, এই তবরুক করিম সাহেবের ট্যাক্সিতে তুলে দাও। ইউসুফ তাই করলেন। এভাবে যখনই মাইজভাণ্ডার শরিফে গিয়েছেন এবং যেখানেই শাহানশাহ্ হুযুরের সাক্ষাৎ ঘটেছে, করিম সাহেবকে খুব আদর-খাতির ও মেহমানদারি করতেন শাহানশাহ্ হুযুর। শাহানশাহ্ হুযুরের এই বিশেষ দৃষ্টি ও আন্তরিক সহানুভূতি-স্নেহের কথা কখনো ভোলা যায় না বলে কৃতজ্ঞচিত্তে জানালেন করিম সাহেব।

চট্টগ্রাম রিয়াজুদ্দিন বাজারে চৈতন্যগলির সামনে এক দরিদ্র মরিচ বিক্রেতার হাতে শাহানশাহ্ হুযুর তুলে দিলেন ৩ হাজার টাকা। ৩ হাজার টাকা দামের ৩ ব্যাটারীর একটি থ্রি-ইন-ওয়ান প্লেয়ার দিতে না পারায় ১ বছর ধরে মেয়েকে বিয়ে দিতে পারছিনা বলে শাহানশাহ্ হুযুরের কাছ থেকে ওই টাকা পেয়ে খুশিতে হাউমাউ করে কেঁদে ফেললেন অভাবী মরিচ বিক্রেতা।

বিশ্বঅলি শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ) মাঝে মাঝে এখানে ওখানে রহস্যজনকভাবে ঘোরাফেরা করতেন। ভক্তদের মধ্যে

নানাজনের গাড়ি নিয়ে যখন ভ্রমণে বের হতেন হঠাৎ করেই ড্রাইভারকে বলতেন, গাড়ি থামাও। গাড়ি থেকে নেমে বা কখনো সঙ্গে থাকা কুদ্দুস মাওলানাসহ নানা ব্যক্তিকে বলতেন, ওই লোকটিকে আমার কাছে ডেকে নিয়ে আসো। আবার কখনো কয়েক হাজার টাকা হাতে দিয়ে কাউকে নির্দেশ দিতেন, এই টাকা ওই আম বিক্রেতা, মরিচ বিক্রেতা বা ইক্ষু বিক্রেতাকে দিয়ে আসো। কখনো নিজে কিছু আম কিনে আম বিক্রেতার হাতে তুলে দিতেন ৫/৭/১০ হাজার টাকা। আবার কখনো দরিদ্র ইক্ষু বা মরিচ বিক্রেতার হাতে প্রতীকী কিছু জিনিস কিনে তুলে দিতেন হাজার হাজার টাকা। এ ধরনের বহু ঘটনা-দৃশ্যের সাক্ষী কাজী করিমুল হুদা। একবার তাঁকে এবং কুদ্দুস মাওলানাকে নিয়ে চট্টগ্রাম শহরে ভ্রমণ করছিলেন শাহানশাহ্ হুযুর। হঠাৎ করেই রিয়াজুদ্দিন বাজার চৈতন্য গলি এলাকায় রাস্তার পাশে এক খুচরা মরিচ বিক্রেতার সামনে এসে গাড়ি থামালেন তিনি। কুদ্দুস মাওলানার হাতে ৩ হাজার টাকা গছিয়ে দরিদ্র মরিচ বিক্রেতাকে দেখিয়ে দিয়ে শাহানশাহ্ হুযুর বললেন, এই টাকা উনাকে দিয়ে আসো। কুদ্দুস মাওলানা মাঝে মধ্যে হুযুরের দেওয়া টাকা নির্দেশ মোতাবেক সবাইকে ঠিকঠাক দিতেন না। এই টাকা দরবারে বুঝিয়ে দিতেন বা কখনো নিজের কাছে রেখে দিতেন। শাহানশাহ্ হুযুর প্রতিনিয়ত নানাজনকে অকাতরে টাকা বিলিয়ে দিতেন বলে গাউসিয়া হক মন্‌জিলে বখতিয়ার সাহেব বা জামাল সিকদার সাহেবরা মাঝে মাঝে কিছু টাকা মন্‌জিলের খরচের জন্য রেখে দিতে চাইতেন। কুদ্দুস মাওলানার উপরও এ নির্দেশনা ছিল। তাই তিনিও মাঝে মধ্যে শাহানশাহ্ হুযুর কর্তৃক বিভিন্ন জনকে বিতরণ করার জন্য দেওয়া টাকা নিজে কিছু বা পুরোটা রেখে দিয়ে সাশ্রয় করতে চাইতেন।

এদিকে শাহানশাহ্ হুযুর কুদ্দুস মাওলানাকে ৩ হাজার টাকা দিয়েছেন মরিচ বিক্রেতাকে দেওয়ার জন্য। কিন্তু কুদ্দুস সাহেব সেই টাকা দরিদ্র লোকটিকে দেন নি বলে তাঁর জানা হয়ে যাওয়ায় গাড়িতে থাকা করিম সাহেবকে হুযুর নির্দেশ দিলেন, কুদ্দুস টাকা দেয়নি। তার কাছ থেকে টাকা নিয়ে আপনি মরিচ বিক্রেতাকে অবশ্যই ৩ হাজার টাকা গছিয়ে দিয়ে আসেন। করিম সাহেব কুদ্দুস থেকে ওই টাকা চেয়ে নিয়ে মরিচ বিক্রেতার হাতে তুলে দিলেন। হঠাৎ করে এত টাকা পেয়ে খুশিতে হাউমাউ করে কেঁদে দিলেন এই লোকটি। জানতে চাইলেন কে এই টাকা দিয়েছে। করিম সাহেব শাহানশাহ্ হুযুরের কথা বললেন। মরিচ বিক্রেতা জানালেন, তাঁর মেয়ের বিয়ে ঠিক হয়েছে এক বছর আগে। বর পক্ষের লোকজন শর্ত দিয়েছেন ৩ ব্যাটারীর বড় একটি থ্রি-ইন-ওয়ান প্লেয়ার অবশ্যই দিতে হবে। কিন্তু ৩ হাজার টাকা দামের এই জিনিসটি দিতে না পারায় ১ বছর ধরে তাঁর মেয়ের বিবাহ ঝুলে আছে। মরিচ বিক্রেতা খুবই দরিদ্র। ৩ হাজার টাকা জোগাড় করে ওই বস্তুটি বর পক্ষকে উপহার হিসেবে দেবেন সেই সামর্থ্য তাঁর নেই। অথচ না চাইতেই হঠাৎ করে গায়েবিভাবে এক সাথে তিন হাজার টাকা শাহানশাহ্ হুযুরের কাছ থেকে পেয়ে খুশিতে আত্মহারা চরম অসহায়গ্রস্ত ওই মরিচ বিক্রেতা। করিম সাহেবকে তিনি বললেন, এই টাকা দিয়ে দামি উপহারটি কিনে কালকেই তিনি মেয়ের বিবাহ দিয়ে দেবেন।

এই হলো শাহানশাহ্ হুযুরের দান ও দয়ার নমুনা। দরিদ্র, চরম অভাবী অসহায় মানুষ খুঁজে খুঁজে তাদের সমস্যা দূর করা ও প্রয়োজন মিটিয়ে দেওয়াই ছিল শাহানশাহ্ হুযুরের জীবনের বড় বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ্‌র এ মহান অলির সত্যিই কোনো তুলনা হয় না বলে জানালেন কাজী করিমুল হুদা।

(চলবে)

ঢাকার সম্মানিত পাঠকদের জন্য

সুসংবাদ

আমরা আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে এখন থেকে ঢাকাস্থ খানকাহ্ শরীফে **মাসিক আলোকধারা** নিয়মিতভাবে পাওয়া যাচ্ছে।

ঠিকানা:

শাহআলী থানাধীন উত্তর বিশিল হযরত শাহ্ আলী বাগদাদী (রহঃ)-র মাজারের পূর্ব গেইট সংলগ্ন স্থানে (খাদেম বাড়ী, ৩য় তলা, বাড়ী#৪, ব্লক#ক, মিরপুর হাউজিং এস্টেট, উত্তর বিশিল, থানা- শাহ আলী, মিরপুর, সেকশন-১, ঢাকা-১২১৬)।

যোগাযোগ: ০১৭১৬-৬৫৫৫৮৩ (খাদেম)

আল্-কুরআনে বর্ণিত দু'আসমূহ : একটি পর্যালোচনা

●ড. মোহাম্মদ ইলিয়াছ ছিদ্দিকী●

প্রতিপাদ্যসার : 'ইবাদত শব্দটি আমাদের মাঝে ব্যাপকভাবে প্রচলিত আছে। মুসলমানদের সম্যকভাবে অবগত থাকা আবশ্যক যে, ইবাদাত বা গোলামী এক, অদ্বিতীয় ও লা-শরীক আল্লাহর জন্যই এককভাবে নির্দিষ্ট। 'ইবাদাত আর কারো জন্যে প্রযোজ্য নয়, হতেও পারে না। এটাই হচ্ছে যুগে যুগে নবী ও রাসূলগণের আনিত ও প্রদর্শিত দ্বীন। আর দ্বীন হচ্ছে শরীয়াত। আর শরীয়াতের দাবী হল 'ইবাদাত। প্রত্যেক নবী রাসূলগণের ঘোষণা ছিল- কুর'আনের ভাষ্যমতে- হে জাতি! তোমরা এক আল্লাহ ব্যতিরেকে অন্য কারো দাসত্ব করো না। এই মহাসৃষ্টির স্রষ্টা হলেন আল্লাহ তা'আলা। তিনিই সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। তিনিই সবকিছু লালন ও প্রতিপালন করেন। আর এতে তাঁর কোন শরীক নেই। তাঁর আদিও নেই, অন্তও নেই। যখন কোন কিছু ছিল না, তখন তিনিই ছিলেন। যখন কোন কিছু থাকবে না, তখনও তিনিই থাকবেন। তিনি যা ইচ্ছা করতে পারেন। কোন কিছু সৃষ্টি করতে চাইলে তিনি শুধু বলেন 'হও' ততক্ষণাৎ তা হয়ে যায়। এ ভাবেই তিনি এ মহাসৃষ্টির সবকিছু করেছেন, সবকিছুর অস্তিত্ব দান করেছেন। সে জন্য তাঁরই 'ইবাদাত করা অপরিহার্য্য। সেই 'ইবাদাতের অন্যতম একটি দিক হলো দু'আ করা। আবার কতগুলো দু'আ আল্লাহ তা'আলা নিজেই শিখিয়ে দিয়েছেন। যেমন; আল্লাহ তা'আলা নিজেই আল্-কুরআনের ৩৪০-এর অধিক স্থানে দু'আর বর্ণনা দিয়েছেন। তাই সে সম্পর্কে জ্ঞান রাখা আবশ্যক। এরই প্রেক্ষিতে আলোচ্য প্রবন্ধে আল্-কুরআনে বর্ণিত দু'আ সমূহ তুলে ধরা হল।

* দু'আ কি 'ইবাদাত ? এর জবাবে تفسير العشر الأخير প্রণেতা বলেন- দোয়াই হল 'ইবাদতের মূল। তিনি নিম্নোক্ত হাদিসকে দলিল হিসেবে পেশ করেন।

عن انس قال قال رسول الله ﷺ الدعاء مخ العبادة (رواه احمد و ابو داؤد والترمذى)

অর্থাৎ হযরত আনাস (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, হুজুর (দ:) এরশাদ করেন- দোয়াই 'ইবাদতের সার।১৭ এ সম্পর্কে নো'মান বিন বশীর থেকে বর্ণিত আছে যে, হুজুর (দ:) এরশাদ করেন-

الدعاء هو العبادة ثم قرأ ادعونى استجب لكم (ابوداؤد والنسائى)

অর্থাৎ দোয়াই 'ইবাদত। অতঃপর তিনি এই আয়াত পড়লেন। তোমরা আমাকে ডাক। আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিব।১৮

সুতরাং দোয়া যে 'ইবাদত তাতে কোন সন্দেহ নেই। অতএব, 'ইবাদত একটি ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ। সাধারণ মানুষ যা ধারণা করেন অর্থাৎ কতিপয় নির্ধারিত অনুষ্ঠানমালা যথা শুধুমাত্র নামাজ, রুকু, সিজদাহ্ জিকর ও তাসবীহ এর নামই 'ইবাদাত। যা সঠিক নয়। বরং 'ইবাদাত হল মানবজাতির সামগ্রিক কল্যাণ সাধন তথা ইহকালিন শান্তি ও পরকালিন মুক্তির লক্ষ্যে কুরআন-সুন্নাহর বিধি মোতাবেক যেই কাজ করা হোক না কেন তারই নাম।

১.দু'আর ফযীলাত: এ সম্পর্কে ২২ টি আয়াত রয়েছে। উদাহারণ স্বরূপ একটি হলো;

واذا سالك عبادى عنى فانى قريب اجيب دعوة الداع اذا دعان فليستجيبوا لى وليؤمنوا بى لعلهم يرشدون

অর্থ: যখন আমার বান্দাহ্গণ আমার সম্পর্কে তোমার নিকট জিজ্ঞেস করে, আমি তো (তাদের) নিকটেই, আহবানকারী যখন আমাকে আহবান করে আমি তার আহবানে সাড়া দিই; সুতরাং তাদের উচিত আমার নির্দেশ মান্য করা এবং আমার প্রতি ঈমান আনা, যাতে তারা সরল পথ প্রাপ্ত হয়।১

এছাড়া অবশিষ্ট ২১ টি আয়াত হলো; সূরা আল্-বাকারা-২০১, সূরা আলি 'ইমরান-৩৮, ৩৯, সূরা মারয়াম-০৭, সূরা ত্বা-হা-৩৬, ৩৭, সূরা আল্-আম্বিয়া-৭৬, ৮৪, ৮৮, ৯০, সূরা আশ্-শুআরা-১১৯,১৭০, সূরা আন্-নামল-৬২, সূরা আল্-কাসাস- ১৬, ২১, সূরা আল্-ফাত্বির-১০, সূরা আস্-সাফ্ফাত-১০১, সূরা সা-দ-৩৬,৪৩ সূরা আল্-মু'মীন-৬০।

২.দু'আর ব্যাপারে উৎসাহ প্রদান: এ সম্পর্কে ০৪ টি আয়াত রয়েছে। উদাহারণ স্বরূপ একটি হলো;

قل امر ربى بالقسط واقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون۔

অর্থ: বল, আমার রব ন্যায়পরায়ণতার নির্দেশ দিয়েছেন, আর প্রত্যেক সালাতে তোমাদের লক্ষ্য ও মনোযোগকে (তাঁর প্রতি) নিবদ্ধ কর, তাঁর আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে তাঁকে ডাক। যেভাবে তোমাদেরকে প্রথমে সৃষ্টি করা হয়েছে (তোমাদের মৃত্যুর পর আবার জীবিত হয়ে) সেভাবেই তোমরা ফিরে আসবে।২

এছাড়া অবশিষ্ট ০৩ টি আয়াত হলো; সূরা আল্-আ'রাফ-৫৫, ৫৬, সূরা আত্-তাওবাহ্- ১০৩।

৩.দু'আর আদব:

৩/১.দু'আয় একাগ্রচিত্ত হওয়া: এ সম্পর্কে মোট ৬টি আয়াত

রয়েছে। যেমন;

هو الذى يسيركم فى البر والبحر حتى اذا كنتم فى الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جائتها ريح عاصف وجائهم الموج من كل مكان وظنوا انهم احيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن انجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين۔

অর্থ: তিনি তোমাদেরকে জলে স্থলে ভ্রমণ করান। এমনকি যখন তোমরা নৌকায় আরোহণ করে অনুকূল হাওয়ার তালে আমোদ আহ্লাদে সফর করতে থাক, তখন ঝড়ো হাওয়া আঘাত হানে আর চারদিক থেকে তরঙ্গ ধেয়ে আসে, আর তারা মনে করে যে, তারা তরঙ্গমালায় পরিবেষ্টিত হয়ে পড়েছে। তখন তারা বিশুদ্ধ আনুগত্যে আল্লাহকে ডেকে বলে, তুমি যদি এ থেকে আমাদেরকে পরিত্রাণ দাও তাহলে অবশ্য অবশ্যই আমরা শুকরগুজার বান্দাহ্ হয়ে যাব।৩

এছাড়া অবশিষ্ট ০৫ টি আয়াত হলো; সূরা আল্-আ'রাফ-২৯, সূরা আল্-'আনকাবুত-৬৫, সূরা আল্-লুকমান-৩২, সূরা আল্-মু'মীন-১৪, ৬৫।

৩/২.সশব্দে ও চুপিসারের মধ্যপন্থা অবলম্বনের মাধ্যমে দু'আ: এ সম্পর্কে মোট ৩টি আয়াত রয়েছে। যেমন;

قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن أياما تدعوا فله الاسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وبتغ بين ذالك سبيلا۔

অর্থ: বল, তোমরা আল্লাহ নামে ডাক বা রহমান নামে ডাক, যে নামেই তাঁকে ডাক না কেন (সবই ভাল) কেননা সকল সুন্দর নামই তো তাঁর। তোমার সালাতে স্বর উচ্চ করো না, আর তা খুব নীচুও কর না, এ দু'য়ের মধ্যবর্তী পথ অবলম্বন কর।৪

এছাড়া অবশিষ্ট ০২ টি আয়াত হলো; সূরা আল্-আ'রাফ-৫৫, ২০৫।

৩/৩. দু'আয় অধিক মাত্রায় পীড়াপীড়ি করা: এ সম্পর্কে মোট ২টি আয়াত রয়েছে। যেমন;

ونادى نوح ربه فقال رب ان ابنى من أهلى وان وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين۔

অর্থ: নূহ তার রবকে আহবান জানাল। সে বলল, হে আমার রব ! আমার পুত্রতো আমার পরিবারভুক্ত, আর তোমার ওয়াদা সত্য আর তুমি বিচারকদের সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক।৫

এছাড়া অবশিষ্ট ০১ টি আয়াত হলো; সূরা মারয়াম-০৪।

৪. দু'আর সময় ও তার উপলক্ষ:

৪/১.যুদ্ধ করার ইচ্ছাকালীন দু'আ: এ সম্পর্কে মোট ২টি আয়াত রয়েছে। যেমন;

وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفرلنا ذنوبنا واسرافنا فى أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔

অর্থ: তাদের মুখ হতে কেবল এ কথাই বেরিয়েছিল- হে আমাদের রব! আমাদের অপরাধগুলো এবং আমাদের কাজকর্মে বাড়াবাড়িগুলোকে তুমি ক্ষমা করে দাও, আমাদেরকে দৃঢ়পদ রেখ এবং কাফিরদলের উপর আমাদেরকে সাহায্য কর।৬

এছাড়া অবশিষ্ট ০১ টি আয়াত হলো; সূরা আল্-বাকারা-২৫০।

৪/২.খারাপ জিনিসের দু'আ: এ সম্পর্কে মোট ২টি আয়াত রয়েছে। যেমন; ويدع الانسان بالشر دعائه بالخير وكان الانسان عجولا

মানুষ (তার নির্বুদ্ধিতার কারণে কল্যাণকর ভেবে) অকল্যাণ প্রার্থনা করে যেমনভাবে কল্যাণ প্রার্থনা করা উচিত। মানুষ বড়ই তাড়াহুড়াকারী।৭

এছাড়া অবশিষ্ট ০১ টি আয়াত হলো; সূরা ইউনুস-১১।

৪/৩.হিদায়াত প্রাপ্তির জন্য দু'আ: এ সম্পর্কে মোট ৫টি আয়াত রয়েছে। যেমন;

الا أن يشاء الله واذكر ربك اذا نسيت وقل عسى ان يهدين ربى لأقرب من هذا رشدا۔

অর্থ: আল্লাহ ইচ্ছে করলে বলা ছাড়া। যদি ভুলে যাও (তবে মনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে) তোমার রবকে স্মরণ কর, আশা করি আমার রব আমাকে এর চেয়েও সত্যের নিকটবর্তী পথে পরিচালিত করবেন। (কেননা এক ব্যক্তি যেভাবেই সঠিক পথে চলুক না কেন, তার চেয়েও উত্তমভাবে পথ চলা যেতে পারে।)৮

এছাড়া অবশিষ্ট ০৪ টি আয়াত হলো; সূরা আল্-ফাতিহা-০৬, সূরা আল্-বাকারা-৭০, সূরা আল্-আ'রাফ-৮৯, সূরা আল্-কাসাস-২২।

৪/৪.ভাল মৃত্যুর জন্য দু'আ: এ সম্পর্কে মোট ১৬টি আয়াত রয়েছে। যেমন;

وضرب الله مثلا للذين أمنوا امرأت فرعون اذ قالت رب ابن لى عندك بيتا فى الجنة ونجنى من فرعون وعمله ونجنى من القوم الظالمين۔

অর্থ: আর যারা ঈমান আনে তাদের ব্যাপারে আল্লাহ ফিরআউনের স্ত্রীর দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন। সে প্রার্থনা করেছিল হে আমার রব! তুমি আমার জন্য তোমার নিকট জান্নাতে একটি ঘর বানিয়ে দাও আর আমাকে তুমি ফির'আউন ও তার (অন্যায়) কার্যকলাপ থেকে রক্ষা কর, উদ্ধার কর আমাকে যালিম সম্প্রদায় থেকে।৯

এছাড়া অবশিষ্ট ১৫ টি আয়াত হলো; সূরা আল্-ফাতিহা-০৬, সূরা আলে-'ইমরান-৮, ১৬, ১৯১, ১৯৩,১৯৪, সূরা আল্-আ'রাফ-১২৬, ১৫৭, সূরা ইউসুফ-১০১, সূরা আশ্-শু'আরা-৮৩, ৮৪, ৮৫,৮৭. সূরা আন্নামল-১৯, সূরা আত্-তুর-২৮।

৪/৫.গোনাহ মোচনের জন্য দু'আ: এ সম্পর্কে মোট ২১টি আয়াত রয়েছে। যেমন;

رب اغفرلی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا

অর্থ: হে আমার রব! তুমি ক্ষমা কর আমাকে, আমার পিতামাতাকে যারা আমার গৃহে মু'মীন হয়ে প্রবেশ করে তাদেরকে আর মু'মীন পুরুষ ও মু'মীন নারীদেরকে; আর যালিমদের জন্য ধ্বংস ছাড়া আর কিছুই বৃদ্ধি করো না।১০

এছাড়া অবশিষ্ট ২০ টি আয়াত হলো; সূরা আল্-বাকারা-৫৮, ২৮৫, সূরা আলি-ইমরান-১৬, ১৩৫, ১৪৭, ১৯৩, সূরা আল্-আ'রাফ-২৩, ১৫১,১৫৫, সূরা আল্-হিজর-৪৭, সূরা ইবরাহীম-৪১, সূরা আলমু'মীনুন-১০৯, ১১৮, সূরা আশ্-শু'আরা-৫১, ৮২, ৮৬, সূরা আল্-কাসাস-১৬, সূরা আল্হাশর-১০, সূরা আল্-মুমতাহিনাহ্-৫, সূরা আল্-মুনাফিকূন-৮।

৪/৬.সন্তান লাভের দু'আ: এ সম্পর্কে মোট ০৩টি আয়াত রয়েছে। যেমন;

هنالک دعا زکریا ربه قال رب هب لی من لدنک ذریة طیبة انک سمیع الدعاء

অর্থ: ওখানেই যাকারিয়া নিজ রবের কাছে প্রার্থনা করে বলল, হে আমার রব! আমাকে তোমার পক্ষ হতে একটি সুসন্তান দান কর। নিশ্চয় তুমি প্রার্থনা শ্রবণকারী।১১

এছাড়া অবশিষ্ট ০২ টি আয়াত হলো; সূরা আল্-আ'রাফ-১৮৯, সূরা আল্-আম্বিয়া-৮৯।

৪/৭.হজ্বের পর দু'আ: এ সম্পর্কে মোট ০১টি আয়াত রয়েছে। যেমন;

لیشهدوا منافع لهم ویذکروا اسم الله فی أیام معلومات علی ما رزقهم من بهیمة الأنعام فکلوا منها وأطعموا البائس الفقیر۔

অর্থ: যাতে তারা তাদের জন্য (এখানে রাখা দুনিয়া ও আখিরাতের) কল্যাণগুলো প্রত্যক্ষ করতে পারে আর তিনি তাদেরকে চতুষ্পদ জন্তু হতে যে রিযক দান করেছেন, নির্দিষ্ট দিনগুলোতে তার উপর আল্লাহর নাম উচ্চারণ করতে পারে। কাজেই তোমরা (নিজেরা) তা থেকে খাও আর দু:স্থ অভাবীদের খাওয়াও।১২

৪/৮.শত্রুর উপর বদ্-দু'আ: এ সম্পর্কে মোট ১০টি আয়াত রয়েছে। যেমন; تبت یدا ابی لهب وتب অর্থ: আবু লাহাবের হাত দু'টো ধ্বংস হোক, ধ্বংস হোক সে নিজে।১৩

এছাড়া অবশিষ্ট ০৯ টি আয়াত হলো; সূরা আল্-বাকারা-২৮৬, সূরা আলি 'ইমরান-১৪৭, সূরা ইউনুস-৮৮, সূরা আল্-আম্বিয়া-১১২, সূরা আল্-'আনকাবূত-৩০, সূরা আল্-কামার-১০, সূরা নূহ-২৪, ২৬, ২৮।

৪/৯.ভয়ের সময় দু'আ: এ সম্পর্কে মোট ০৪টি আয়াত রয়েছে। যেমন;

الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل

অর্থ:যাদেরকে লোকে খবর দিয়েছিল যে, একটা বড় বাহিনী তোমাদের বিরুদ্ধে জড়ো হচ্ছে, কাজেই তাদেরকে ভয় কর। তখন তা তাদের ঈমান বৃদ্ধি করে দিল এবং তারা বলল, আমাদের জন্যে আল্লাহই যথেষ্ট এবং তিনি কতইনা উত্তম কর্মবিধায়ক।১৪

এছাড়া অবশিষ্ট ০৩ টি আয়াত হলো; সূরা আল-'আনয়াম-৬৩, সূরা আল্-কাসাস-২১,৩৩।

৪/১০.অসুস্থতার সময় দু'আ: এ সম্পর্কে মোট ০২টি আয়াত রয়েছে। যেমন;

وأیوب اذ نادی ربه أنی مسنی الضر وأنت أرحم الراحمین

অর্থ: স্মরণ কর আইয়ূবের কথা, যখন সে তার রবকে ডেকেছিল: (এই বলে যে) আমি দু:খ কষ্টে নিপতিত হয়েছি, তুমি তো দয়ালুদের সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু।১৫

এছাড়া অবশিষ্ট ০১ টি আয়াত হলো; সূরা সা-দ-৪১।

৪/১১.জন্তুর উপর আরোহণের দু'আ: এ সম্পর্কে মোট ০২টি আয়াত রয়েছে। যেমন;

لتستوا علی ظهوره ثم تذکروا نعمة ربکم اذا استویتم علیه وتقولوا سبحان الذی سخر لنا هذا وما کنا له مقرنین

অর্থ: যাতে তোমরা যখন তাদের পিঠে স্থির হয়ে বস, তখন যেন তোমাদের রবের অনুগ্রহের কথা স্মরণ কর আর বল-মহান ও পবিত্র তিনি যিনি, এগুলোকে আমাদের (ব্যবহারের জন্য) বশীভূত করে দিয়েছেন, আমরা এগুলোকে বশীভূত করতে সক্ষম ছিলাম না।১৬

এছাড়া অবশিষ্ট ০১ টি আয়াত হলো; সূরা আয্-যুখরুফ-১৪।

৪/১২.বালা-মুসিবতের সময় দু'আ: এ সম্পর্কে মোট ২৯টি আয়াত রয়েছে। যেমন; فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون۔

অর্থ: (কিন্তু তারা ছিল আক্রমণমুখী) তখন সে তার রবের নিকট দু'আ করল-এরা অপরাধী জাতি।১৭

এছাড়া অবশিষ্ট ২৮টি আয়াত হলো; সূরা আল্-'আনয়াম-৪০, ৪১, ৬৩, সূরা আল্-আ'রাফ-৯৪, ১২৬, সূরা ইউনুস-১২, ২২, ৮৬, সূরা বানী ইসরাঈল-৬৭, সূরা আল্-কাহ্ফ-১০, সূরা আল্-আম্বিয়া-৮৭, সূরা আল্-মু'মিনূন-২৬, ৩৯, সূরা আশ্শু'আরা-১১৭-১১৯, ১৬৯, সূরা আন্-নামল-৬২, সূরা আল্-কাসাস-১২, ১৬, ২৪, ৪৭, সূরা আল্-'আনকাবূত-৬৫, সূরা আর-রূম-৩৩, সূরা আল্-লুকমান-৩২,

সূরা আয্-যুমার-৮,৪৯, সূরা ফুসসিলাত-৫১, সূরা আদ্-দুখান-২২।

৪/১৩. মুসলিমদের জন্য দু'আ: এ সম্পর্কে মোট ০২টি আয়াত রয়েছে। যেমন;

والذين جاؤ من بعدهم يقولون ربنا اغفرلنا ولا خواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل فى قلوبنا غلاًللذين أمنوا ربنا انك رؤوف رحيم۔

অর্থ: (এ সম্পদ তাদের জন্যও) যারা অগ্রবর্তীদের পরে (ইসলামের ছায়াতলে) এসেছে। তারা বলে- হে আমাদের রব! আমাদেরকে আর আমাদের ভাইদেরকে ক্ষমা কর যারা ঈমানের ক্ষেত্রে আমাদের অগ্রবর্তী হয়েছে, আর যারা ঈমান এনেছে তাদের ব্যাপারে আমাদের অন্তরে কোন হিংসা-বিদ্বেষ রেখ না। হে আমাদের রব! তুমি বড়ই করুণাময়, অতি দয়ালু।১৮

এছাড়া অবশিষ্ট ০১টি আয়াত হলো; সূরা নূহ-২৮।

৫. নবীগণের দু'আ: এ সম্পর্কে সর্বমোট ৯৫ টি আয়াত রয়েছে। যেমন;

فاصبر لحكم ربك ولاتكن كصاحب الحوت اذ نادى وهو مكظوم۔

অর্থ: কাজেই তুমি তোমার রবের বিধানের জন্য ধৈর্য্য ধরে অপেক্ষা কর, আর মাছওয়ালা (ইউনুস আ.)এর মত (অধৈর্য্য) হয়ো না। স্মরণ কর যখন সে তার রবকে ডাক দিয়েছিল চিন্তায় দু:খে আচ্ছন্ন হয়ে।১৯

এছাড়া অবশিষ্ট ৯৪টি আয়াত হলো; সূরা আল্-বাকারা-১২৪-১২৯, ২৬০, সূরা আলে 'ইমরান-৩৮, ৪১, সূরা আল্-মায়িদা-১১৪, সূরা আল্-আ'রাফ-২৩, ৮৯, ১৩৪, ১৩৫, ১৪৩, ১৫১, ১৫৫, সূরা আত্-তাওবাহ্-১২৯, সূরা ইউনুস-৮৮,৮৯, সূরা হুদ-৪৫, সূরা ইউসুফ-৩৩, ৩৪, ৮৩, ৯২, ১০১, সূরা ইবরাহীম-১৫,৩৫-৪১, সূরা বানী ইসরাঈল-৮০, সূরা মারয়াম-৪-৭,১০, সূরা ত্বা-হা-২৫-৩৫, সূরা আল্-আম্বিয়া-৭৬,৮৩,৮৪, ৮৭, ৮৯, ৯০, সূরা আল্-মু'মিনুন-২৬, ২৯, ৩৯, ৯৩, ৯৪, ৯৭, ৯৮, ১১৮, সূরা আশ্শু'আরা-১৩, ৭৮-৮৯,১১৭, ১১৮, ১৮৯, সূরা আন্-নামল-১৯, সূরা আল্-কাহফ-৩৪, সূরা আল্-'আনকাবুত-৩০, সূরা আস্-সাফ্ফাত-৭৫, ১০০, সূরা সা-দ-৩৫, সূরা আল্-মু'মীন-২৭, সূরা আদ্-দুখান-২০,২২, সূরা আল্-জাসিয়া-১০, সূরা আল্-মুমতাহিনাহ্-৪, সূরা আল্-কলম-৪৮, সূরা নূহ-২৬-২৮।

৬. মু'মীনগণের দু'আ: এ সম্পর্কে সর্বমোট ৩৮ টি আয়াত রয়েছে। যেমন; انا كنا من قبل ندعوه انه هو البر الرحيم

অর্থ: পূর্বে আমরা তাঁর কাছেই দু'আ করতাম, তিনি অতি অনুগ্রহকারী, পরম দয়াবান।২০

এছাড়া অবশিষ্ট ৩৭টি আয়াত হলো; সূরা আল্-ফাতিহা-৫, ৬, সূরা আলে-'ইমরান-৩৫, ৩৬, ৫৩, ১৯১-১৯৪, সূরা আন্-নিসা-৭৫, সূরা আল্-মায়িদাহ্-৮৩, সূরা ইউনুস-৮৫,৮৬, সূরা বানী ইসরাঈল-২৪, ৮০, ১১০, ১১১, সূরা আল্-কাহফ-২৪, সূরা আল্-মু'মিনুন-১০৯, সূরা আল্-ফুরক্বান-৬৫,৭৪, সূরা আল্-মু'মীন-৪৪, সূরা আল্-আহকাফ-১৫, সূরা আত্-তুর- ২৮, সূরা আল্-মুমতাহিনাহ্-৪,৫, সূরা আত্-তাহরীম-১১, সূরা আল্-ফালাক-১-৫, সূরা আন্-নাস-১-৬।

৭.মু'মীনদের জন্য ফিরিশতাদের দু'আ: এ সম্পর্কে সর্বমোট ০৪ টি আয়াত রয়েছে। যেমন;

قالوا أتعجبين من أمر الله رحمت الله وبركاته عليكم أهل البيت انه حميد مجيد

অর্থ: তারা বলল, আল্লাহর কাজে তুমি আশ্চর্য্য হচ্ছ, ওহে (ইবরাহীমের) পরিবারবর্গ! তোমাদের উপর রয়েছে আল্লাহর দয়া ও বারাকাত, তিনি বড়ই প্রশংসিত, বড়ই মহান।২১

এছাড়া অবশিষ্ট ০৩ টি আয়াত হলো; সূরা আল্-মু'মীন-৭-৯।

৮. দু'আ কবুল হওয়া:

৮/১. নবীগণের দু'আ কবুল হওয়া: এ সম্পর্কে সর্বমোট ৩৬ টি আয়াত রয়েছে। যেমন; فاجتبه ربه فجعله من الصالحين

অর্থ: এভাবে তার রব তাকে বেছে নিলেন আর তাকে সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত করলেন।২২

এছাড়া অবশিষ্ট ৩৫টি আয়াত হলো; সূরা আল্-বাকারা-৩১-৩৪, ২৬০, আলি-'ইমরান-৩৯, ৪১, আল্-মায়িদাহ্-১১৫, ইউনুস-৮৯, ইউসুফ-৩৪, মারইয়াম-৭, ১০, ত্বা-হা-৩৬, আল্-আম্বিয়া-৭৬, ৭৭, ৮৪, ৮৮, ৯০, আশ্-শু'আরা-১১৯, ১২০, ১৭১-১৭৩, আল্-কাসাস-৩৫, আস্-সাফ্ফাত-৭৫, ১০১, ছ-দ-২৫, ৩৬, ৩৯, আদ্-দুখান-২৩, ২৪, আল্-জারিয়া-১১-১৩।

৮/২.মু'মীনগণের দু'আ কবুল হওয়া: এ সম্পর্কে সর্বমোট ০৮ টি আয়াত রয়েছে। যেমন;

ويستجيب الذين أمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد۔

অর্থ:যারা ঈমান আনে আর সৎকর্ম করে তিনি তাদের আহবান শুনেন, আর তিনি তাদের প্রতি নিজ অনুগ্রহ বাড়িয়ে দেন আর কাফিরদের জন্য আছে কঠিন শাস্তি।২৩

এছাড়া অবশিষ্ট ০৭ টি আয়াত হলো; সূরা আল্-বাকারা-১৮৬, আলি-'ইমরান-৩৭, ১৯৫, আল্-আনফাল-৯, আল্-মু'মীন-৪৫,৪৬,৬০ ।

৯.গায়রুল্লাহর জন্য দু'আর সম্মুখীন হওয়া: এ সম্পর্কে সর্বমোট ২৫ টি আয়াত রয়েছে। যেমন;

ومن أضل ممن يدعوا من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون۔

অর্থ: তার চেয়ে অধিক গোমরাহ কে, যে আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুকে ডাকে যা কিয়ামত পর্যন্ত তাকে সাড়া দেবে না, আর তাদের ডাকাডাকি সম্পর্কেও তারা(একদম) বেখবর?২৪

এছাড়া অবশিষ্ট ২৪টি আয়াত হলো; সূরা আল্-আন'আম-৭১, আল্-আ'রাফ-১৯৪, ১৯৫, ১৯৭, ইনূস-১০৬, হুদ-১০১, আর-রা'দ-১৪, বানী ইসরাঈল-৫৬, ৬৭, আল্-কাহফ-৫২, আল্-হাজ্ব-১২, ৬২, ৭৩, আশ্-শু'আরা-২১৩, আল্-কাসাস-৬৪, আল্-লুকমান-৩০, সাবা-৩২, আল্-ফাত্বির-১৩, ১৪, ৪০, আয্-যুমার-৩৮, আল্-মু'মীন-২০, ফুস্-সিলাত-৪৮, আয্-যুখরুফ-৮৬।

শেষ কথা ঃ সুতরাং আল্লাহ তা'আলার এ মহাসৃষ্টির উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করতে হলে বাস্তব জীবনের সকল পর্যায়, ক্ষেত্র ও দিকে আল্লাহ তা'আলার দেওয়া জীবন বিধান কায়েম করতে হবে। আর তা সম্ভব কুর'আন-সুন্নাহ ও রাসুলের আদর্শ বাস্তবায়নের মাধ্যমে। এ ছাড়া সৃষ্টির উদ্দেশ্যই ব্যাহত ও ব্যর্থ হবে। আসলে আনুষ্ঠানিক ইবাদাত হলো আল্লাহ তা'আলার আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি, সম্মান প্রদর্শন, দৈহিক ও আর্থিক আনুগত্য প্রকাশ এবং বাস্তব জীবনের সকল পর্যায় ও ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত জীবন ব্যবস্থা বাস্তবায়নের প্রতিশ্রুতি ও অঙ্গীকার প্রদান। এই স্বীকৃতি, সম্মান, আনুগত্য, প্রতিশ্রুতি ও অঙ্গীকারের বাস্তব রূপায়ন ও প্রতিফলন হয় জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে, ক্ষেত্রে ও দিকে আল্লাহ তা'আলার দেয়া জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে।

পরিশেষে দু'আ প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত হাদীসটি উল্লেখ করছি। হযরত নু'মান বিন বশীর (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করিম (দ.) এরশাদ করেন: দু'আ হল মূল 'ইবাদাত। অতঃপর তিনি (দ.)(দলীলস্বরূপ) এ আয়াতটি তেলাওয়াত করেন: তোমাদের রব বলেন, তোমরা আমার কাছে দু'আ কর। আমি তোমাদের দু'আ কবুল করব। নিশ্চয় যে সব লোক আমার 'ইবাদাত (অর্থাৎ আমার নিকট দু'আ করা) থেকে বিরত থাকে এবং অহংকার করে, তারা অচিরেই অসম্মানিত হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। (তিরমিযী/৩২৪৭)। এ হাদীসের উপর আমল করার জন্য আল্লাহ আমাদের সবাইকে তাওফীক দান করুন।

(Footnotes)

১ সূরা আল্-বাকারা, ১৮৬, আল্-কুরআন।

২ সূরা আল্-আ'রাফ- ২৯, আল্-কুরআন।

৩ সূরা ইউনুস-২২, আল্-কুরআন।

৪ সূরা বনী ইসরাঈল-১১০, আল্-কুরআন।

৫ সূরা হুদ-৪৫, আল্-কুরআন।

৬ সূরা আলে-ইমরান-১৪৭, আল্-কুরআন।

৭ সূরা বানী ইসরাঈল- ১১, আল্-কুরআন।

৮ সূরা আল্-কাহ্ফ- ২৪, আল্-কুরআন।

৯ সূরা আত্-তাহরীম- ১১, আল্-কুরআন।

১০ সূরা নুহ: ২৮, আল্-কুরআন।

১১ সূরা আলে 'ইমরান- ৩৮, আল্-কুরআন।

১২ সূরা আল্-হজ্ব-২৮, আল্-কুরআন।

১৩ সূরা আল্-লাহাব-০১, আল্-কুরআন।

১৪ সূরা আলে 'ইমরান-১৭৩, আল্-কুরআন।

১৫ সূরা আল্-আম্বিয়া-৮৩, আল্-কুরআন।

১৬ সূরা আয্-যুখরূপ-১৩, আল্-কুরআন।

১৭ সূরা আদ্-দুখান-২২, আল্-কুরআন।

১৮ সূরা আল্-হাশর-১০, আল্-কুরআন।

১৯ সূরা আল্-কলম-৪৮, আল্-কুরআন।

২০ সূরা আত্-তুর-২৮, আল্-কুরআন।

২১ সূরা হুদ-৭৩, আল্-কুরআন।

২২ সূরা আল্-কলম-৫০, আল্-কুরআন।

২৩ সূরা আশ্-শুরা-২৬, আল্-কুরআন।

২৪ সূরা আল্-আহকাফ-৫, আল্-কুরআন।

ঈমাম নাসায়ী আলাইহির রহমাহ্

● কাজী মুহাম্মদ ইব্রাহীম ●

হযরত ঈমাম নাসায়ী ছিলেন হিজরী তৃতীয় শতাব্দীর হাদীসের ঈমাম, হুজ্জাহ্, হাফিজ, মুফাচ্ছির, মুজতাহিদ, সমালোচক ও ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে অভিজ্ঞ মহাপুরুষ। তিনি ছিলেন নির্ভিক আপোষহীন ও সত্য প্রকাশে অটল, অনড় ব্যক্তিত্ব। হাদীস শরীফের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে তাঁর দক্ষতা ছিল সত্যিই প্রশংসনীয়। সিহাহ্ সিত্তার ঈমামদের মাঝে তিনি সর্ব কনিষ্ঠ হলেও সহীহ হাদীস নির্ধারণে তাঁর শর্তাবলী ছিল অন্যান্যদের চেয়ে অনেক বেশী কঠিন।

জন্ম ও বংশ পরিচয়: ঈমাম নাসায়ী আলাইহির রহমাহ্ ২১৫ হিজরী মোতাবেক ৮৩০ ঈসায়ী সালে খুরাসানের "নাসা' নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। অন্যমতে, তিনি ২১৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন ঈমাম নাসায়ীকে তাঁর জন্ম সর্ম্পকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন- (আরবী) অর্থাৎ সম্ভবত আমার জন্মসন ২১৫ হিজরী। তাঁর নাম আহমদ, উপনাম আবু আবদির রহমান। তাঁর বংশ তালিকা হল, আহমদ তৎপিতা শোয়াইব তৎপিতা আলী তৎপিতা বাহার তৎপিতা দীনার আল খোরাসানী ওয়ান নাসায়ী আলাইহিমুর রহমাহ্। তাঁর জন্মস্থান নাসা শহরের প্রতি সম্পৃক্ত করে তাঁকে,' ঈমাম নাসায়ী' বলা হয়।

শিক্ষা জীবন: ঈমাম নাসায়ীর প্রাথমিক শিক্ষা নিজ মাতৃভূমি 'নাসা' শহরে শুরু হয় এবং নিজ শহরে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন। শৈশব থেকে তিনি প্রখর স্মৃতি শক্তির অধিকারী ছিলেন। ফলে আট বছর বয়সে কুরআনুল ক্বাদীমের হেফজ সমাপ্ত করেন। বাল্যকাল থেকে 'ইলমে নাহল, ছরফ, ফিকাহ্, উসুলুব-ফিকাহ এবং হাদীসের চর্চা শুরু করেন। এ সময় তিনি উস্তাদদের তাত্ত্বিক আলোচনা আত্মস্থ করার চেষ্টা করতেন এবং বিভিন্ন বিষয়ে জটিল জটিল প্রশ্ন করতেন এতে তাঁর শিক্ষকেরা অল্প বয়স থেকে তাঁর সর্ম্পকে আলাদা ধারণা পোষণ করতেন। তাঁর বয়স পনের হতে না হতে তিনি জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্যে মাতৃভূমি ত্যাগ করে বিভিন্ন দেশে গমন করেন। এ সর্ম্পকে ঈমাম যাহাবী আলাইহির রহমাহ বলেন- "হাদীস শিক্ষার জন্য ঈমাম নাসায়ী খুরাসান, হিযায, মিশর, ইরাক, জাযীরাহ্, সিরিয়া এবং সীমান্ত এলাকায় ভ্রমণ করেন। অত:পর মিশরে নিবাস গ্রহণ করেন। হাদীসের হাফিজগণ তাঁর নিকট গমন করতেন। তাঁর যুগে হাদীসে তাঁর সমকক্ষ কেউ ছিলনা" ঈমাম নাসায়ী বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করে অসংখ্য ওস্তাদদের নিকট থেকে হাদীস শিক্ষা অর্জন করেন। সুনানু কুবরায় তাঁর ৪৫০ জন শিক্ষকের সংখ্যা উল্লেখ করেন। ঈমাম নাসায়ী ছিলেন তাঁর যুগের একজন অন্যতম সেরা হাদীস বিশারদ সুতরাং দূর-দূরান্ত থেকে অনেক ছাত্র তাঁর নিকট গমন করে ইলমে দীনের শিক্ষা নিতেন। তাঁর ছাত্রের সংখ্যা ছিল অগনিত।

আকৃতি ও প্রকৃতি: ঈমাম ইবনে কছীর রচিত আলবিদায়াহ্ ওয়ান নিহায়াহ্ গ্রন্থের বর্ণানামতে ঈমাম নাসায়ী আলাইহির রহমাহ দেখতে খুব সুন্দর ছিলেন। তাঁর গায়ের রং ছিল লাল-সাদা মিশ্রিত এবং চেহারা ছিল অর্পূব সৌন্দর্যমন্ডিত। গোলাম রসুল সাইদী রচিত তাযকেরাতুল মুহাদ্দিসীন কিতাবের ভাষ্যমতে, বৃদ্ধ বয়সেও তাঁর সৌন্দর্য এতটুকু ম্লান হয়নি। পোষাক পরিচ্ছেদ পরিধানের ব্যাপারেও তিনি সজাগ ছিলেন। রঙ্গীন ও দামী পোষাক ব্যবহার করতেন। তাঁর প্রিয় খাবার ছিল মুরগীর গোশত। হাফেজ মিয়াজি রচিত তাহযীবুল কামাল গ্রন্থে উল্লেখ আছে হাফিজ ইবনে মুযাফ্ফর বলেন- "আমি মিশরে আমার শায়খগণের নিকট শুনেছি, তাঁরা আবু আবদির রহমান নাসায়ীকে অগ্রাধিকার প্রদান করেন এবং ঈমামতের স্বীকৃতি দেন। তাঁরা ঈমাম নাসায়ী এর রাত্র দিবসের কঠোর ইবাদত এবং প্রত্যেক বছর হজ্জ পালন ও নিরবচ্ছিন্ন ইজতিহাদের প্রশংসা করে। তিনি মিশরে শাসকদের সঙ্গী হয়ে একটি জিহাদে অংশ নেন। মুসলমানদের নিষ্কৃতি প্রদানে সুন্নাহ্র প্রতিষ্ঠা এবং তাঁর বীরত্বের প্রশংসা করা হয়। অনুরূপভাবে তিনি যে সুলতানের সঙ্গী হয়ে জিহাদে অংশ গ্রহণ করেছেন তাঁর দরবার থেকে বিরত থাকা এবং নিজস্ব আবাসেও পানাহারের ক্ষেত্রে প্রশস্ততা গ্রহণ না করার জন্য তাঁর প্রশংসা করা হয়। শহীদ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এটাই ছিল তাঁর চিরাচরিত নীতি" আল বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ্ গ্রন্থমতে, তিনি হযরত দাউদ আলাইহিস সালামের মত একদিন পর একদিন রোযা রাখতেন। ইবনে খাল্লিকান রচিত আইয়ান গ্রন্থে উল্লেখ আছে-"তিনি সত্য-ভাষী, সহিষ্ণু, ধৈর্যশীল এবং অসাধারণ ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন ছিলেন"।

মাযহাব: ঈমাম নাসায়ী যে শহরে জন্মগ্রহণ করেন সেই নাসা শহরের বেশীর ভাগ অধিবাসী ছিল হানাফি মাজহাবের অনুসারী। এ জন্য অনেকেই ধারণা করে থাকেন ঈমাম নাসায়ীও হানাফী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। ইবনে আসীরের মতে তিনি শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। উক্ত মাযহাবের উপর তাঁর অনেক মাসয়ালা-মাসায়িল রয়েছে। আল্লামা তাজুদ্দিন আস সুবকি শাহ ওলীউল্লাহ দেহলভী প্রমুখ এ মতটি সমর্থন করে। আবনে তায়মিয়্যাহ প্রমুখের মতে তিনি হাম্বলি মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। ড. আহসান সাইয়েদ বলেন "এ সকল মতামত বিবেচনা ও ঈমাম নাসায়ীর জীবন পর্যালোচনা করে আমরা দেখতে পাই প্রকৃত পক্ষে তিনি এককভাবে কোন মাযহাবের অনুসারী ছিলেন না। বরং তিনি ছিলেন একজন উঁচুস্তরের ফকীহ ও মুজতাহিদ। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ইসলামী শরীয়তের বিধি-বিধানের ব্যাপারে কুরআন-হাদীস থেকে সরাসরি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে আমল করতেন এবং ভক্ত-শিষ্যদেরও শরীয়তের বিধি-বিধান সম্পর্কে অনুরূপ সমাধান দিতেন। এ ক্ষেত্রে তাঁর কোন সিদ্ধান্ত শাফেয়ী মাযহাবের অনুরূপ হত আবার কোন কোন সিদ্ধান্ত হাম্বলী মাযহাবের অনুরূপ

হত বিধায় তাঁকে বিভিন্ন আলিম কর্তৃক শাফেয়ী ও হাম্বলী মতাবলম্বী হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়"।

রচনাবলী: ঈমাম নাসায়ী হাদীস, তাফসির ও ফিক্‌হ বিষয়ে অনেক কিতাব রচনা করেন। তা থেকে কয়েকটি নিম্নে পেশ করলাম- ১. আস-সুনানুল কুবরা ২. আস-সুনানুস-সুগরা ৩. তফসিরুন নাসায়ী ৪. কিতাবুল খাসাইস ফী ফদ্বলি'আলী ইবনে আবী তালিব' ৫. তাসমিয়াতু-ফুকাহাইল আনসার বিল আসহাবি রাসূলিল্লাহ্ (দঃ) ওয়ামান বা'দাহু মিন-আহলিল মাদীনাহ্ ৬. কিতাবুত-তামযীয ৭.আলজারহ ওয়াত-তা'দীল ৮. আত-তাবক্বাত ৯. ফাযাইলুলকুরআন ১০. মুসনাদু আলী ইবনে আবী তালিব ১১. কিতাবু ফাদ্বায়িলিস-সাহাবা ১২. আমালুল ইয়াওমি ওয়া লাইলাতি ১৩. কিতাবুল ইখাওয়াত ওয়াল আখওয়াত ইত্যাদি। ঈমাম নাসায়ী আলাইহির রহমাহ্ 'সুনানুল কুবরা' থেকে দুর্বল সনদযুক্ত হাদীসগুলোকে বাদ দিয়ে 'আস-সুনানুস-সুগরা' নামে একটি হাদীসগ্রন্থ সংকলন করেন এবং তার নামকরণ করেন 'আলমুজতাবা মিনাস সুনান'। পরবর্তীতে এ গ্রন্থটি সিত্তার অন্তর্ভুক্ত হয়।

ওফাত শরীফ: মিশরে ঈমাম নাসায়ীর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়লে তিনি এক শ্রেণীর তথাকথিত আলিমগণের প্রতিহিংসার শিকার হন। ফলে তিনি ৩০২ হিজরী মোতাবেক ৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে সিরিয়ার দামেস্কে গমন করেন। ড. আহসান সাইয়েদ বলেন-"ঈমাম নাসায়ীর মিশর ত্যাগের উপরোক্ত কারণ আমরা বিভিন্ন ঐতিহাসিক ও লেখকের বর্ণনায় দেখতে পাই। কেননা ঈমাম নাসায়ীর সাথে মিশরের কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠির সাথে এমন কোন ঘটনা কিংবা মনোমালিন্য সৃষ্টি হয়নি যাতে তিনি বিরক্ত হয়ে মিশর ত্যাগ করেন। উপরন্তু তিনি শুধু একজন হাদীস বিশারদই ছিলেন না বরং আধ্যাত্মিক সাধক হিসেবেও পরিচিত ছিলেন। আমাদের মতে তিনি রামলা, দামেস্ক তথা সিরিয়াবাসীদের ইসলামের পথে হেদায়তের উদ্দেশ্যেই মিশর ত্যাগ করে রামলা গমন করেন"। সিরিয়ার লোকেরা হযরত মাওলা আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু সম্পর্কে নানা ধরণের কু-ধারণা পোষণ করতে শুরু করেন। হযরত মওলা আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু সম্পর্কে তাদের অহেতুক ভুল ধারণা দুরীকরণের উদ্দেশ্যে ঈমাম নাসায়ী 'কিতাবুল খাসায়িস ফী ফদ্বলে আলী ইবনে আবি তালিব' শীর্ষক যে গ্রন্থ রচনা করেছিলেন, সেই গ্রন্থখানা সাথে নিয়েই তিনি প্রথমে রামলা ও পরে দামেস্কে গমন করেন। দামেস্কের বড় মসজিদে জনগণের সামনে তিনি হযরত আলী মাওলার উন্নত চারিত্রিক বৈশিষ্ট ও তাঁর বহুবিধ গুণাবলী সম্বলিত তাঁর রচিত গ্রন্থখানা পাঠ করেছিলেন। কিন্তু দামেস্কবাসী ঈমামের সততা অনুধাবণ করেননি বরং তারা ঈমাম নাসায়ীকে শিয়া মতবাদের প্রচারক হিসাবে সাব্যস্ত করেন এবং অভিযোগের সুরে জিজ্ঞেস করেন-আপনি কি আমীরে মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু সম্পর্কে কোন গ্রন্থ লিখেননি? ঈমামের প্রতি উত্তর শুনে সমবেত জনতা ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেন এবং ঈমাম নাসায়ীকে মসজিদ থেকে বের করে দেন, গালিগালাজ ও প্রহার করেন। পূর্ব থেকেই দামেস্কবাসী মনে করত যে ঈমাম নাসায়ী একজন কট্টর শিয়া মতাবলম্বী। তাই তারা এ সময় ঈমাম নাসায়ীকে চরমভাবে মারধর করে। এ আঘাতই তাঁর ইন্তেকালের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। মসজিদের সামনে আহত ঈমামকে তাঁর কতিপয় ভক্ত-শিষ্য ঘিরে ধরেন, তিনি তাঁদেরকে বলেন,-আমাকে মক্কা শরীফে পৌঁছিয়ে দাও। তাঁরা অতিকষ্টে ঈমাম নাসায়ীকে মক্কা শরীফে পৌঁছিয়ে দেন। তাঁর ইচ্ছা মক্কা শরীফেই তিনি যেন শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করতে পারেন। আল্লাহ্‌তায়ালা ঈমামের উক্ত ইচ্ছাটি পূর্ণ করেন। তিনি ৩০৩ হিজরী ১৩ সফর পবিত্র মক্কা শরীফে ইন্তেকাল করেন, এবং সাফা ও মারওয়া পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানে তাঁকে সমাহিত করা হয়। ওফাতকালে তাঁর বয়স হয়েছিলে ৮৮ বছর।

ঈমাম নাসায়ী সম্পর্কে উলামায়ে কিরামের মন্তব্য: ১. ঈমাম দারাকুতনী আলাইহির রহমাহ্ বলেন,-(আরবী) অর্থাৎ 'আবু আব্দির রহমান (ঈমাম নাসায়ী) তাঁর সমসাময়িক হাদীসবিদগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন'। ২. ইবনে কাসীর আলাইহির রহমাহ্ বলেন- 'ঈমাম নাসায়ী ছিলেন তাঁর যুগের ঈমাম হাদীস শাস্ত্রবিদ ও সে যুগের পন্ডিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠ।' ৩. হাফিজ আবু ইয়ালী আলাইহির রহমাহ্ বলেন- 'তিনি ছিলেন প্রতিষ্ঠিত হাফিজ। হাদীসের হাফিজগণ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন। তাঁরা তাঁর হিফজ এবং হদীস বর্ণনা বিশস্ততার ব্যাপারে। রাবী বিশ্লেষণে তাঁর মন্তব্যের উপর নির্ভর করা হত'। ৪. ঈমাম যাহাবী আলাইহির রহমাহ্ বলেন, 'ঈমাম নাসায়ী ছিলেন, সুখ্যাতি সম্পন্ন ঈমাম, সুপ্রতিষ্ঠিত (হাদীসের) হাফিজ এবং সুপ্রসিদ্ধ জ্ঞানীদের অন্যতম। তিনি ছিলেন জ্ঞান-সমুদ্র। সাথ সাথে তাঁর ছিল বুক-শক্তি, দৃঢ়তা, দুরদৃষ্টি, রাবী বিশ্লেষণের জ্ঞান এবং সুসংকলন-যোগ্যতা।' ৫. হাকিম আব্দিল্লাহ্ আন-নায়সাপুরী বলেন,-'আবু আলী আলহাফিজ একাধিকবার তাঁর চোখে দেখা চারজন মুসলিম ঈমামের নাম উচ্চারণ করতে গিয়ে আবু আব্দির রহমান (ঈমাম নাসায়ী) এর নাম প্রথম উচ্চারণ করেন।' ৬. ইবনে আদী আলাইহির রহমাহ্ বলেন, 'আমি ফকীহ্ মনসুর এবং ঈমাম আবু জাফর তাহাবী (রাঃ) কে বলতে শুনেছি, আবু আব্দির রহমান নাসাঈ মুসলিম ঈমামগণের মধ্যে অন্যতম ছিলেন।

তথ্যসূত্র

১. ড. আহসান সাইয়েদ, হাদীস সংলনের ইতিবৃত্ত, এ্যাডর্ণ পাবলিকেশন, ঢাকা-চট্টগ্রাম, প্রথম প্রকাশ ২০০১ইং পৃষ্ঠা-১১২-১২৪।

২. ড. মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান, আস-সিহাহ্ আস-সিত্তাহ পরিচিতি ও পর্যালোচনা, আল মাকতাবাতুশ-শাফিয়া, রাজশাহী, প্রথম প্রকাশ-২০০২, পৃষ্ঠা-১০৭-১২৮।

লাইলাতুল ক্বদরের তাৎপর্য ও আমল

● মুহাম্মদ রবিউল আলম ●

সকল মাস যেমন মর্যাদাগতভাবে সমান নয়, তেমনি সকল দিন-রাতও সমান নয়। লাইলাতুল কদরও সাধারণ রাতের অন্তর্ভুক্ত নয়; বরং এ রাত অন্য হাজার রাতের চেয়ে মর্যাদাপূর্ণ। এ রাতের তাৎপর্য পবিত্র কুরআন-সুন্নাহ্ দ্বারা প্রমানিত। নিম্নে এ রাতের তাৎপর্য তুলে ধরার প্রয়াস পেলাম।

কুরআনের আলোকে তাৎপর্যঃ লাইলাতুল কদরের তাৎপর্য পবিত্র কুরআন দ্বারা স্বীকৃত। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ্তায়ালা ইরশাদ করেন-

انا انزلناه فی لیلة القدر ـ وما ادراک ما لیلة القدر ـ لیلة القدر خیرمّن الف شهر ـ تنزل الملائکة والروح فیها باذن ربهم من کل امر سلام هی حتی مطلع الفجر ـ

"১. নিশ্চয় আমি কুরআনকে অবতীর্ণ করেছি কদরের রাতে ২. আপনি কি জানেন কদরের রাত কী? ৩. কদরের রাত হচ্ছে হাজার মাসের চেয়েও উত্তম ৪. এ রাতে ফিরিশ্তাগণ ও রূহ্ (হযরত জিবরাঈল বা বিশেষ ফিরিশ্তা) প্রত্যেক কাজে তাদের প্রভুর অনুমতিক্রমে অবতীর্ণ হয় ৫. (সে আদেশবার্তা হচ্ছে চিরন্তন) প্রশান্তি, তা উষার আবির্ভাব পর্যন্ত অব্যাহত থাকে।"

মহান আল্লাহ্ অন্যত্র ইরশাদ করেছেন-২

انا انزلناه فی لیلة مبارکة انا کنا منذرین ـ فیها یفرق کل امر حکیم

"৩.নিশ্চয় আমি কুরআনকে একটি গুরুত্বপূর্ণ রাতে অবতীর্ণ করেছি আর অবশ্যই আমি হচ্ছি সতর্ককারী। ৪. এ রাতে প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ কাজের ফয়সালা করা হয়।"

উল্লিখিত বর্ণনা থেকে বুঝা যায় যে,কদরের রাত অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ এবং অন্য হাজার মাসের হাজার হাজার রাত থেকেও উত্তম।

হাদিসের আলোকে তাৎপর্যঃ লাইলাতুল কদর অন্বেষণ এবং তারপর তাকে উদযাপন করা সম্পর্কে অসংখ্য সহিহ্ হাদিস রয়েছে। তন্মধ্যে কয়েকটি হাদিস নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

এক. হযরত উবাদাহ্ বিন সামিত থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন-৩

انه سأل رسول الله ﷺ عن لیلة القدر فقال رسول الله ﷺ فی رمضان' فالتمسوها فی العشر الاواخر' فانها فی وتر فی احدی وعشرین' أو ثلاث وعشرین' أو خمس وعشرین' أو سبع وعشرین' أو تسع وعشرین' أو فی آخر لیلة فمن قامها ابتغائها ایمانا واحتسابا' ثم وفقت له غفر له ما تقدّم من ذنبه وما تأخّر

"তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে লাইলাতুল কদর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন- তোমরা লাইলাতুল কদরকে রমজান মাসের শেষ দশ দিনের মধ্যে বিজোর তারিখের রাতে তথা ২১ বা ২৩ বা ২৫ অথবা ২৭ অথবা ২৯ কিংবা অন্য কোন রাতে তালাশ কর। যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে সওয়াবের আশায় লাইলাতুল কদরকে তালাশ করে উদযাপন করল, তার যেন পূর্বাপর সকল গুনাহ্ ক্ষমা হবার তাওফিক হলো।"

দুই. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-৪

انی أریت لیلة القدر هم انسیتها او نسیتها فالتمسوها فی العشر الاواخر فی الوتر وانی رایت انی اسجد فی ماء وطین

"লাইলাতুল কদরের নির্দিষ্ট তারিখ আমাকে জানানো হয়েছে। তারপর আমাকে ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে। অতঃপর তোমরা লাইলাতুল কদরকে রমজানের শেষ দশ বিজোড় রাতে তালাশ করো। আর আমি নিজেকে মাটি ও পানির মধ্যে সিজদাহ্ দিতে দেখেছি।"

তিন. হযরত আবু হুরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-৫

من قام لیلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدّم من ذنبه

"যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে সওয়াবের আশায় লাইলাতুল কদর উদযাপন করল, তার অতীতের সকল গুনাহ্ যেন ক্ষমা হয়ে গেলো।"

উল্লিখিত হাদিস থেকে বুঝা গেলো যে, লাইলাতুল কদর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই উদযাপন করেছেন এবং সাহাবায়ে কিরামগণকে নির্দেশ দিলেন যাতে এ রাত তালাশ করে উদযাপন করে। কেননা এ রাত যে ব্যক্তি উদযাপন করবে, তার অতীতের সকল গুনাহ্ ক্ষমা হয়ে যাবে।

এ রাত মর্যাদাবান হবার প্রেক্ষাপটঃ এ রাত মর্যাদাবান হবার কয়েকটি প্রেক্ষাপট রয়েছে। তন্মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রেক্ষাপট নিম্নে উল্লেখ করলাম।

এক. হযরত মুজাহিদ বর্ণনা করেন-৬

ان النبی ﷺ ذکر رجلا من بنی اسرائیل لبس السلاح فی سبیل الله تعالی الف شهر فعجب المسلمون من ذلک وتقاصرت الیهم أعمالهم فانزل الله تعالی السورة

"অবশ্যই নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার

বনি ইসরাঈলের এক ব্যক্তির কথা আলোচনা করলেন,যিনি এক হাজার মাস পর্যন্ত আল্লাহর পথে সশস্ত্র জেহাদে অংশগ্রহণ করেছিলেন। মুসলমানগণ এতদশ্রবণে আশ্চর্যান্বিত হলেন এবং তাদের আমলকে নিতান্ত কম মনে করলেন। ফলে আল্লাহ্তায়ালা এ সূরা অবতীর্ণ করলেন।

দুই. হযরত আলি বিন উরওয়াহ বর্ণনা করেন-৭

ذكر رسول الله ﷺ يوما أربعة من بني اسرائيل عبدوا الله تعالى ثمانين عاما لم يعصوه طرفة عين فذكر ايوب وزكريا وحزقيل بن العجوز ويوشع بن نون فعجب اصحاب رسول الله ﷺ من ذلك فاتاه جبريل عليه السلام فقال يا محمد عجبت امتك من عبادة هؤلاء النفر ثمانين سنة فقد أنزل الله تعالى عليك خيرا من ذلك فقرا عليه (انا انزلناه) الخ ثم قال هذا أفضل مما عجبت أنت وأمتك منه فسر بذلك رسول الله ﷺ

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা বনি ইসরাঈলের চারজন আবেদের কথা আলোচনা করলেন, যারা আশি বছর ইবাদত করেছেন অথচ এক মুহূর্তের জন্যও তারা পাপ করেননি। তারপর তিনি হযরত আইয়ুব, হযরত যাকারিয়া, হযরত হাযকিল বিন আজূয এবং হযরত ইউশা বিন নূন আলাইহিমুস সালামের কথা আলোচনা করেলেন। এতে সাহাবায়ে কিরাম আশ্চর্যান্বিত হলে হযরত জিবরাঈল আলাইহিস্সালাম রাসূলুল্লাহ্র নিকট আগমন করে ইরশাদ করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল, আপনার উম্মত উল্লিখিত আবেদদের আশি বছরের ইবাদতের কথা শুনে আশ্চর্যান্বিত হয়ে গেছেন। অতঃপর আল্লাহ্তায়ালা আশি বছরের চেয়েও উত্তম সময় উম্মতে মুহাম্মদির জন্য নাযিল করলেন। তারপর তিনি সূরা কদর পাঠ করলেন। অতঃপর তিনি বললেন, যে সময়ের জন্য আপনি এবং আপনার উম্মত আশ্চর্যান্বিত হয়েছেন তার চেয়ে এ সময় অধিক উত্তম। এতে রাসূলুল্লাহ আনন্দিত হলেন।"

তিন. ইমাম মালিক বর্ণনা করেছেন-৮

انه سمع من يثق به من اهل العلم يقول ان رسول الله ﷺ ارى اعمار الناس قبله أو ما شاء الله من ذلك فكانه تقاصر أعمار امته ان لا يبلغوا من العمل مثل الذى بلغ غيرهم فى طول العمر فاعطاه الله ليلة القدر خير من الف شهر

"ইমাম মালিক নির্ভরযোগ্য আলেমের কাছে বলতে শুনেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পূর্ববর্তী লোকদের বয়স সম্পর্কে আল্লাহ্তায়ালা যতটুকু চেয়েছেন অবহিত করেছেন। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন উম্মতের বয়স তদপেক্ষা কম মনে করলেন আর ভাবলেন যে, আমার উম্মত দীর্ঘকাল তাদের সমপরিমাণ আমল করতে সক্ষম হবে না। তখন আল্লাহ তায়ালা কদরের রাত দান করলেন, যা হাজার মাস অপেক্ষাও উত্তম।"

চার. কেউ কেউ বর্ণনা করেছেন-৯

ان الرجل فيما مضى ما كان يقال له عابد حتى يعبد الله تعالى ألف شهر فاعطوا ليلة ان أحيوها كانوا احق بأن يسموا عابدين من أولئك العباد

"পূর্ববর্তী সময়ে কোন ব্যক্তিকে আবেদ বলার জন্য হাজার মাস আল্লাহ্র ইবাদত করার প্রয়োজন হতো। তাই (উম্মতে মুহাম্মদির বয়স কম হওয়ার কারণে) উম্মতে মুহাম্মদিকে এমন এক রাত প্রদান করা হলো, যদি তারা এ রাত উদযাপন করে, তাহলে তারা আবেদদের অন্তর্ভুক্ত হবার জন্য পূর্ববর্তীদের চেয়ে অধিক হকদার হয়ে যাবে।"

উল্লিখিত বর্ণনা থেকে বুঝা গেছে যে, পূর্ববর্তী লোকেরা হাজার বছর ইবাদত করার সুযোগ পেত এবং উম্মতে মুহাম্মদি তার চেয়ে অনেক কম বয়স পান। এ জন্য মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন এ উম্মতকে এমন এক রাত প্রদান করেছেন, যা হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম। এ রাতে ইবাদত করা হাজার মাস ইবাদত করার চেয়ে শ্রেয়।

লাইলাতুল কদর হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম হবার অর্থঃ

লাইলাতুল কদর হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম হবার অর্থ হল ঐ এক রাতের কৃত ইবাদত অন্যান্য হাজার রাতের কৃত ইবাদত অপেক্ষা উত্তম। আর যেহেতু এক হাজার মাস সমান তিরাশি বছর চার মাস হয়, সেহেতু যে ব্যক্তি লাইলাতুল কদর পেল এবং তাতে ইবাদত করল, সে যেন তিরাশি বছর চার মাস ইবাদত করার চেয়ে অধিক সময়ের ইবাদত করল। আল্লাহ্তায়ালা লাইলাতুল কদরকে হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম বলেছেন; তবে সমান বলেননি। এ উত্তম কী পরিমাণ? একগুণ, না দুই গুণ, না আরো বেশি, তা আল্লাহই ভালো জানেন।

লাইলাতুল কদরের আমলঃ

এ রাতে প্রত্যেক ভালো কাজ করা যাবে। যেহেতু এ রাত ভালো কাজের মাধ্যমে উদযাপন করা মুস্তাহাব সেহেতু নামাজ, কুরআন তেলাওয়াত, দরূদ শরিফ পাঠ ইত্যাদি করা যাবে। তবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এ রাতের কোন নির্দিষ্ট নামাজ বর্ণিত নেই; কিন্তু সলফে সালেহিনদের থেকে নির্দিষ্ট নামাজ বর্ণিত রয়েছে। হযরত আবুল লাইছ আলাইহির রাহমাহ বলেন, এ রাতের সর্ব নিম্ন নামাজ হচ্ছে দুই রাকাত আর সর্বোচ্চ নামাজ হচ্ছে এক হাজার রাকাত এবং মধ্যমপন্থী নামাজ হচ্ছে একশত রাকাত। নামাজের নিয়ম হচ্ছে - প্রতি দুই রাকাতের পর সালাম ফিরাবে এবং প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতিহার পর

একবার সূরা কদর এবং তিনবার সূরা ইখলাছ পড়তে হবে। সালাম ফিরানোর পর দরূদ শরিফ পড়তে হবে।১০ এ রাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্‌র দরবারে দোয়া করতেন এবং ক্ষমা চাইতেন। এ প্রসঙ্গে হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা থেকে বর্ণিত রয়েছে। তিনি বলেন-১১

قلت يارسول الله أرأيت ان علمت اى ليلة ليلة القدر ما أقول فيها ؟ قال قولى اللهم انك عفوّ تحب العفو فاعف عنى

"আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি যদি জানতে পারি যে, কোন রাত শবে কদর, তাহলে কোন দোয়া আমি পড়বো? তিনি ইরশাদ করেছেন, তুমি এ দোয়া পাঠ করো-

اللهم انك عفوّ تحب العفو فاعف عنى

(অর্থ- হে আল্লাহ্! তুমি ক্ষমাশীল, তুমি ক্ষমা করতে ভালোবাস কর। সুতরাং আমাকে ক্ষমা করে দাও)

লাইলাতুল কদরের নিদর্শনাবলীঃ লাইলাতুল কদরের কতিপয় নিদর্শন রয়েছে। এ প্রসঙ্গে হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবন আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুমা থেকে বর্ণিত রয়েছে। তিনি বলেন-১২

ان رسول الله ﷺ قال فى ليلة القدر ليلة سمحة طلقة لا حارة ولا باردة يصبح شمسها صبيحتها ضعيفة حمراء

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লাইলাতুল কদর সম্পর্কে ইরশাদ করেছেন-ইহা একটি মৃদু আলোকোজ্জ্বল রাত, যাতে না আছে গরম, না আছে ঠাণ্ডা; তারপরের দিন সূর্য উদিত হবে ক্ষীণ ও লাল বর্ণ হয়ে।"

হযরত ওয়াসিলা রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-১৩

ليلة القدر بلجة' لا حارة ولا باردة' ولا سحاب فيها' ولا مطر' ولا ريح' ولا يرمى فيها نجم' ومن علامة يومها تطلع الشمس لا شعاع لها

"ইহা একটি মৃদ আলোকজ্জ্বল রাত, যাতে না আছে গরম, না আছে ঠাণ্ডা, না আছে মেঘ, না আছে বৃষ্টি, না আছে অতি বাতাস আর না কোন তারা এ রাতে বর্ষিত হবে। দিনের আলামত হচ্ছে - পরের দিনে সূর্য উদিত হবে কিরণহীন অবস্থায়।"

উপরিউক্ত হাদিস শরিফ থেকে বোঝা গেলো যে, লাইলাতুল কদরের রাতটি হবে নাতিশীতোষ্ণ এবং মেঘ-বৃষ্টি ও বাতাস বিহীন আর পরদিনের আলামত হচ্ছে-সূর্য উদিত হবে কিরণ বিহীনভাবে।

(Endnotes)

১. সূরা কদর ঃ আয়াত ১-৫।

২. সূরা দুখান ঃ আয়াত ৩-৪।

৩. হাফিয আলি হায়ছমি, গায়াতুল মাকসাদ ফি যাওয়ায়িদিল মুসনাদ, মাকতাবাতু সয়দিল ফাওয়ায়িদ, খ.১, পৃ. ১৯৭৪।

৪. ইমাম বুখারি, আস-সহিহ, দারু তুকিন নাজাহ, বৈরুত, ১ম সংস্করণ ১৪২২ হি, হাদিস নং-২০১৬, খ.৩, পৃ.৪৬; ইমাম মুসলিম, আস-সহিহ, দারুল জিয়াল, বৈরুত, হাদিস নং-২৮২৯, খ.৩, পৃ.১৭২।

৫. ইমাম বুখারি, প্রাগুক্ত, হাদিস নং-১৯০১, খ.৩, পৃ.২৬; ইমাম মুসলিম, প্রাগুক্ত, হাদিস নং-১৮১৭, খ.২, পৃ.১৭৭।

৬. ইমাম বায়হাকি, আস-সুনানুল কুবরাহ, মাকতাবাতু দারুল বাজ, মক্কা শরিফ, ১৪১৪ হি., হাদিস নং-৮৩০৫, খ.৩, পৃ.৩০৬; আল্লামা আলুসি, রুহুল বয়ান, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, ১ম সংস্করণ ১৪১৫হি., খ.১৫, পৃ.৪১৫।

৭. ইবনু আবি হাতিম, তাফসিরুল কুরআন, আল-মাকতাবাতুল আসরিয়্যাহ, সয়দা, হাদিস নং-১৯৯৫১, খ.১০, পৃ.৩৩৯৭; আল্লামা আলুসি, প্রাগুক্ত, খ.১৫, পৃ.৪১৫।

৮. ইমাম মালিক, আল-মুয়াত্তা, দারু ইহইয়ায়িত তুরাসিল আরবি, বৈরুত, ১৪০৬হি., হাদিস নং-১৫, খ.১, পৃ.৩২১; ইমাম বায়হাকি, শুয়াবুল ঈমান, মাকতাবাতুর রুশদ লিন্-নশর ওয়াত্ তাওযি, রিয়াদ, ১ম সংস্করণ ১৪২৩ হি., হাদিস নং-৩৩৯৫, খ.৫, পৃ.২৫৬; আলুসি, প্রাগুক্ত, খ.১৫ পৃ.৫১৫-৪১৬।

৯. আল্লামা আলুসি, প্রাগুক্ত, খ.১৫, পৃ.৪১৫।

১০. আল্লামা ইসমাইল হক্কি, রুহুল বয়ান, দারুল ফিকর, বৈরুত, খ.১০, পৃ.৪৮৩।

১১. ইমাম তিরমিযি, আস-সুনান, দারুল গারবির ইসলামি, বৈরুত, ১৯৯৮ ইং, খ.৫, পৃ.৪১৬; ইমাম ইবন মাজাহ, আস-সুনান, দারুল ফিকর, বৈরুত, খ.২, পৃ.১২৫৬; ইমাম বায়হাকি, আস-সুনানুল কুবরাহ, মাকতাবাতুর রুশদ, ১৪২২ হি, খ.৩, পৃ.৪০৫।

১২. ইমাম বায়হাকি, শুয়াবুল ঈমান, মাকতাবাতুর রুশদ, রিয়াদ, ১ম সংস্করণ, ১৪২৩ হি., খ.৫, পৃ.২৭৫; আবু দাউদ তায়ালিসি, আল-মুসনাদ, হিজর লিত্-তাবায়া ওয়ান নশর, ১ম সংস্করণ ১৪১৯ হি., খ.৪, ৪০১।

১৩. ইমাম তাবরানি, আল-মুজামুল কবির, মাকতাবাতুল উলুম ওয়াল হিকাম, মৌসুল, ২য় সংস্করণ ১৪০৪ হি., খ.২২, পৃ.৫৯; আল্লামা আলি হায়ছমি, মাজমাউজ জাওয়াঈদ, দারুল ফিকর, বৈরুত, ১৪১২ হি, খ.৩, পৃ.২৩২।

তাজকিয়া বিতর্ক প্রতিযোগিতা ২০১৩

॥১॥

মাইজভাণ্ডারী দর্শন বলি বা সুফিবাদ বলি গভীর দর্শন এবং আধ্যাত্মিক প্রবাহের এই ধারা মানব আত্মার পরিশুদ্ধি এবং সৃষ্টিকে স্রষ্টার স্বরূপ উপলব্ধি করার জন্য প্রস্তুত করতে সতত সচেষ্ট। আত্মার পরিশুদ্ধির এই প্রস্তুতি পর্বে যে কেবল ধর্মীয় আধ্যাত্মবাদ স্থান পাবে তা কিন্তু নয়। সমাজ, সংস্কৃতি, পারিবারিক মূল্যবোধ থেকে শুরু করে সংসার বা চাকরিও এই পরিশুদ্ধি প্রক্রিয়ার আওতাধীন। একজন শুদ্ধ আত্মার মানুষ যেমন এই বিষয়গুলোতে শুভ্রতা ছড়িয়ে দেবে তেমনি জাগতিক এই বিষয়গুলো মনস্তত্ত্বের উপর কিরূপ প্রভাব ফেলে তা নিরূপণ করাটাও জরুরি। নতুবা শুদ্ধি পাঠ অসম্পূর্ণ থাকে। বিষয়ের গভীরে পৌঁছে তাকে বিশ্লেষণ করতে পারা, যুক্তি প্রয়োগ, তথ্য ও উপাত্ত ঘেটে বের করা এবং উপলব্ধ সত্যকে নির্ভিক এবং সার্বজনিনভাবে প্রকাশ করাটা একবিংশ শতাব্দির একটি শুদ্ধি পিয়াসী মনের আবশ্যকিয় বৈশিষ্ট্য। আর এর চর্চাটা যত দ্রুত সম্ভব শুরু করাটা জরুরি।

মাইজভাণ্ডারী পরিমণ্ডলে তরুণ প্রজন্ম বরাবরই উপেক্ষিত। অথচ নৈতিক শিক্ষার এই মহাবিদ্যালয়ের সর্বোত্তম শিক্ষার্থী এই তরুণরাই। তরুণদের নিয়ে গড়া তারুণ্যের সংগঠন 'তাজকিয়া' সেই লক্ষ্যটাকেই বুকে ধারণ করে চলে। এই লক্ষ্য পূরণে তাজকিয়া বিতর্ক চর্চাকে ধারণ করেছে। বিতর্ক চর্চা কেবল যে শুধু জ্ঞানের গভীরতা এবং যুক্তি প্রয়োগের ক্ষমতা বাড়িয়ে তোলে তা নয় বরং তা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক এবং ব্যবহারিক। জাতীয় সংসদ থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয়, সেমিনার, ভাষণ প্রভৃতি জায়গাগুলোতে বিতর্ক চর্চার প্রভাব রয়েছে।

আমাদের তরুণদের মাঝে এই মননশীল চর্চাটাকে উদ্বুদ্ধ করতে আমরা বিগত ৫ জুলাই একটি বিতর্ক প্রতিযোগিতার আয়োজন করি নাসিরাবাদ সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে। তবে তার এক সপ্তাহ পূর্বে একটি বিতর্ক কর্মশালার আয়োজন করা হয় লায়ন্স ফাউন্ডেশনস্থ রোকেয়া-হালিমা মেমোরিয়াল হলে। পুরো বিতর্ক প্রতিযোগিতায় মোট চব্বিশটি দলের প্রায় একশজন তরুণ অংশগ্রহণ করে। আমরা প্রথমবারের মত এমন কিছু একটা আমাদের এই ঘরানার সাথে যুক্ত করার প্রচেষ্টা চালিয়েছি। প্রাথমিক ভীতি কাটিয়ে উঠার পর দেখলাম এমন কিছু একটা মনে মনে সবাই খুঁজছিল। তরুণদের তাদের প্রাণের কথা, আবেগের কথা বলার একটা প্লাটফরম করে দেয়ার প্রয়াস ছিল এই "তাজকিয়া বিতর্ক প্রতিযোগিতা ২০১৩"।

॥২॥

পরিকল্পনার পর মাঠে নেমে এমন চিন্তা হল অংশগ্রহণকারী কোথায় পাই? আমরা চাচ্ছিলাম তরুণ প্রজন্মটাকে। এবং তারা যেনো আমাদের মাইজভাণ্ডারী ঘরানার হয়। তাই মাইজভাণ্ডারী গাউসিয়া হক কমিটির কাছে প্রস্তাব দিলাম আমাদের কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করার জন্য। হক কমিটির কেন্দ্রিয় শাখার সভাপতি সহ অন্যান্যরাও বেশ উৎসাহ দেখালেন। উনারা বিভিন্ন শাখা কমিটির কাছে আমাদের প্রতিযোগিতার রেজিস্ট্রেশন ফরম পাঠিয়ে দিলেন। এবার অপেক্ষার পালা। এ ধরণের আয়োজন প্রথমবার হচ্ছে তাছাড়া বিতর্কের সাথে অনেকেরই তেমন কোন পরিচয় নেই। তাই প্রায়শই ফোন আসত কী হচ্ছে, কিভাবে হবে, বিষয় কী কী থাকবে ইত্যাদি। আমাকে একজন ফোন করে রীতিমত বিষয়ও ঠিক করে দিয়েছিল এবং বলেছিল এর বাইরে বিষয় যাতে না হয়! সামগ্রিক এ ভীতিই আমাদের পুরো কার্যক্রমটার প্রয়োজনীয়তাকে আরো প্রাসঙ্গিক করে তুলল। আমরা টের পেলাম বাইরের জগতটা যখন রাজনীতি, সমাজনীতি, বর্ণবাদ, অর্থনীতির মত প্রাসঙ্গিক এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে তর্কের তুফান তুলছে - আমরা সে সব বিষয়ে কথা বলার মত কণ্ঠস্বর খুঁজে পাচ্ছি না। আরো ভয়াবহ হল সে সব বিষয়ে জানার আগ্রহই আমাদের তৈরি হয় নি। তবু আমাদের অবাক করে দিয়ে প্রায় বিশটি শাখা কমিটি থেকে বিতর্ক দল রেজিস্ট্রেশন করল। এদের মধ্যে দু'একটা দল বেশ দূরবর্তী এলাকা থেকে এসেছিল। তাদের আগ্রহ এবং স্বতস্ফূর্ততা আমাদর নতুন করে আশান্বিত করেছে। বিশেষ করে চক্রশালা, খরনা, পাইন্দং, মিরসরাই, নোয়াজিশপুর, মুকুটনাইট, উদালিয়া, দলইনগর ইত্যাদি দূরবর্তী এলাকাগুলো থেকে শাখা কমিটির লোকজন তাদের তরুণ প্রজন্ম নিয়ে আমাদের সাথে অংশগ্রহণ করে এবং পুরো বিতর্ক প্রতিযোগিতাকে একটা ভিন্ন আমেজ প্রদান করে। চট্টগ্রাম শহরস্থ কমিটিগুলোর যেমন মাকিরঘাট, কদমতলি, কাপাসগোলা, আতুরার ডিপো, বাকলিয়া ইত্যাদি শাখাগুলো আমাদের খুব কাছের বন্ধু হয়ে গেছে ওই প্রতিযোগিতার মাধ্যমে। ভিন্ন ধরণের দু'টো সংগঠনও আমাদেরকে দল পাঠায় - একটা হল ফটিকছড়ি গবেষণাধর্মী জ্যোতি ফোরাম এবং চট্টগ্রাম শহরের অরণি সাহিত্য পরিষদ। আর এই বৈচিত্রকে মাধুর্য দিতে যুক্ত হয় জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসার চারটা দল, যাদের মধ্যে দু'টা দল ফাইনালে উঠে। চ্যাম্পিয়ন দলের নাম "কাওকাব"। ৮ জুলাই 'বিএমএ' অডিটোরিয়ামে সকল অংশগ্রহণকারী দল ক্রেস্ট ও সার্টিফিকেট গ্রহণ করে। আমরা ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষাব্যবস্থার ছাত্রদের মধ্যে একটা মিথস্ক্রিয়া তৈরি করতে চেয়েছিলাম। প্রথম প্রয়াসে আমরা অনেকাংশেই সফল।

॥৩॥

বিতর্ক প্রতিযোগিতার প্রশিক্ষক এবং প্রতিযোগিতার বিচারকদের আগ্রহও আমাদের আনন্দিত করেছে। প্রশিক্ষকদের পুরো প্যানেলটা তৈরি করেছে প্রিমিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়-এর প্রভাষক এবং বিতর্ক সংগঠন 'দৃষ্টি'র সাধারণ সম্পাদক সাইফুদ্দিন মুন্না। প্রথমবার তাকে আমাদের পরিকল্পনার কথা বলার পর এই যে সে যুক্ত হল শেষ দিন পর্যন্ত আমাদের সাথেই ছিল। তার সাথে ছিল চুয়েটের এহসান, জেঙ্গি। কর্মশালায় উচ্চারণের উপর ক্লাসটি নিয়েছিলেন অরুণ ভদ্র। অংশগ্রহণকারী প্রায় একশ বিতার্কিকরা এই ক্লাসটি সবচেয়ে বেশি উপভোগ করে কেননা এখানে ভদ্র সাহেব চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছিলেন আমরা যা বলি তার প্রায় সবই ভুল। সবচেয়ে বেশি মজা হল যখন উনি অংশগ্রহণকারিদেরকে ডেকে ডেকে জিজ্ঞাস করলেন, আপনারা কয় ভাই-বোন, এবং প্রায় সকলেই ভাইকে 'বাই' এবং বোনকে 'ভোন' বানিয়ে ফেলল! তরুণদের বৈশিষ্ট্য হল এই ভুলটুকু যখন সামনে ধরা পড়ে তখন মন খারাপ না করে জানার আনন্দে তাদের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠে। পুরো কর্মশালা জুড়ে ছিল এমন উজ্জ্বল সব মুখের ছড়াছড়ি।

প্রতিযোগিতার বিচারকদের নিয়ে বেশ চিন্তিত ছিলাম। আমাদের সকাল ৯টার মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু করতে হবে কিন্তু বিচারকরা সময়মত পৌঁছবে কি না সে নিয়ে সন্দেহ। আমাদের বিচারক ছিল আবার দু'ধরণের - জ্ঞানের ধারক ও বাহক শিক্ষকরা ছিলেন, তাদের সাথে ছিল চট্টগ্রামের প্রখ্যাত বিতর্ক সংগঠন চুয়েট ডিবেটিং সোসাইটির বিতার্কিকরা। বিচারকরা আমাদের হতাশ করেননি,

তারা ঠিক ঠিক সময়মতো এসে হাজির। চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের সাবেক পরিচালক প্রশাসন অধ্যাপক মোঃ গোলাম রসূল, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সরফুদ্দিন রাশেদ, এইচ এম কামরুল হাসান, খলিল মীর ডিগ্রী কলেজের সরফরাজ খান স্যাররা সময়মতো এসে আমাদের রীতিমতো লজ্জায় ফেলে দিলেন কেননা বিতার্কিকদের জন্য তৈরি করা আইডি কার্ড তখনো আমাদের হাতে এসে পৌঁছেনি! তবে সবচেয়ে বেশি কষ্ট করেছে চুয়েট ডি.এস. এর তরুণ বিচারকরা। বেচারারা ৬ জন দল বেঁধে ভোর ছ'টায় সেই রাঙ্গুনিয়া চুয়েট থেকে রওনা হয়েছিল আমাদের সহযোগিতা করার জন্য। সকাল ১০:৩০-এর দিকে চুয়েট ডি.এস. এর চীফ মডারেটর ড. উজ্জ্বল কুমার দেব স্যার আসলেন আমাদের প্রতিযোগিতা দেখতে। এসে যে আমাদের সাথে যুক্ত হলেন সন্ধ্যা ৭টার সময় সেমি ফাইনাল বিতর্কটা শেষ করে তারপর বের হলেন। সারাদিন জুড়ে স্যাররা বিতার্কিকদের বিচার কাজের পাশাপাশি তাদের সাথে গল্প করে পরামর্শ দিয়ে, সাহস দিয়ে প্রতিযোগিতা জমিয়ে তোলেন। পরিবেশটা ছিল আনন্দমুখর; উত্তেজনায় ভরপুর। এই প্রতিযোগিতা প্রত্যন্ত অঞ্চলের প্রগতিশীল তরুণগুলোর সাথে আমাদের শহরের প্রখ্যাত বিদ্যাপীঠের এইসব মননশীল শিক্ষকদের সাথে পরিচিত হবার এবং তাদেরকে অন্যভাবে জানার সুযোগ করে দিয়েছে। বিপরীত দিক থেকে দেখলে মাইজভাণ্ডারী ঘরানার তরুণরাও দেখিয়ে দিয়েছে তাদের ভেতরকার অদম্য স্পৃহা এবং সমাজের চিন্তাশীল অংশ এবং প্রগতিশীল সংগঠনগুলো তাদেরকে নতুনভাবে চিনতে এবং সমীহ করতে শুরু করেছে।

॥৪॥

পুরো আয়োজনের বিষয়ে লিখতে গেলো কিছু মানুষের কথা লিখতে হয়। আমাদের তাজকিয়ার দু'জন মামা আছেন। যাদের কাছে আমরা সময়ে সময়ে মামাবাড়ির আবদার নিয়ে যাই। আশরাফুজ্জামান আশরাফ এবং মেজবাহ উদ্দিন। দু'জন পুরো আয়োজনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত হাটে মাঠে ঘাটে আমাদের পাশে ছিলেন। পুরো অনুষ্ঠানের যাবতীয় আপ্যায়নের গুরুদায়িত্ব পালন করেছেন এ এস এম সায়েম সুমন, অর্থ সম্পাদনায় আকবর আলি, প্রকাশনা ও শৃঙ্খলায় মোজাম্মেল আহমেদ। তাজকিয়ার সভাপতি এইচ আর মেহবুব ছিল ছায়াসঙ্গি। তাছাড়া ফয়সাল-ইশরাকরা ছোটাছুটি করেছিল লাগামহীনভাবে। পুরস্কার বিতরণীর দিন পুরো আয়োজনের সুন্দর পরিসমাপ্তিতে মাইজভাণ্ডারী গান পরিবেশন করে মাইজভাণ্ডারী মরমী গোষ্ঠি। আর আয়োজনের তহবিল এসেছিল শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ) ট্রাস্ট থেকে।

॥৫॥

আমাদের ঘরানার তরুণদের অনেক বড় একটা দল আনন্দ ও উত্তেজনা নিয়ে তৈরি করেছিল একটা প্লাটফরম, যেখানে আরো অনেক তরুণ চর্চা শুরু করেছে প্রগতিশীলতার - যার সাক্ষি হয়ে আছে সমাজের চিন্তাশীল অংশ এবং অন্যান্য আধুনিক সংগঠনগুলো। স্থানীয় প্রায় সব এবং জাতিয় দু'টা পত্রিকায় খবর এসেছে, একটা টিভি চ্যানেল-এ দেখিয়েছে এই আয়োজন। আমাদের সত্ত্বায় লালিত মাইজভাণ্ডারী দর্শন এবং অন্তরে শায়িত আধ্যাত্ম পুরুষগণের শুদ্ধ আত্মার আদর্শের প্রচার এবং বাস্তবায়নে যুগোপযোগি এবং আধুনিক একটা পদক্ষেপ এই বিতর্ক আয়োজন। নিখাদ প্রেম ভরা এই প্রজন্ম তাদের ভালবাসা, শ্রদ্ধা, ভক্তি আর বিশ্বাসের কথা দৃঢ় কণ্ঠে যুক্তির বলে উচ্চারিত করবে, সামগ্রিক এই আয়োজন ছিল এই চাওয়ার প্রতিফলনের প্রয়াসের শুরু।

অন্তু নুর, প্রধান সমন্বয়ক
তাজকিয়া বিতর্ক প্রতিযোগিতা ২০১৩

শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ) বৃত্তি পরীক্ষা ২০১৩-এর ফলাফল ঘোষিত

সম্প্রতি শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ) বৃত্তি তহবিল আয়োজিত বৃত্তি পরীক্ষা ২০১৩-এর ফলাফল ঘোষণা করা হয়েছে। স্কুল ও কলেজ বিভাগে ২৪ জন এবং মাদ্রাসা বিভাগে মোট ১০ জন সর্বমোট ৩৪ জন ছাত্র-ছাত্রী বৃত্তির জন্য নির্বাচিত হয়েছে। ঘোষিত ফলাফল নিম্নরূপঃ

স্কুল ও কলেজ বিভাগঃ ৫ম শ্রেণিঃ শাহিনুর অভি, পিতা-নুর মোহাম্মদ, চট্টগ্রাম সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়। শাহরিয়ার ইসলাম, পিতা-নূরুল ইসলাম, কাঞ্চননগর শিশু কানন কে জি স্কুল। আফরিন জাহান, পিতা-মোহাম্মদ রোকনুজ্জামান, অংকুর সোসাইটি স্কুল। জয়ব্রত দে, পিতা-গান্ধী দে, বারমাসিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। **৬ষ্ঠ শ্রেণিঃ** জেবা ফারজানা, পিতা-আবদুল হামিদ, চট্টগ্রাম সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়। আরমান হোসেন চৌধুরী, পিতা-আমির হোসেন চৌধুরী, মেট্রোপলিটান রেসিডেন্সিয়েল স্কুল। তাজউদ্দিন আহমদ, পিতা-মোঃ আলাউদ্দিন, বারমাসিয়া আবদুল করিম উচ্চ বিদ্যালয়। **৭ম শ্রেণিঃ** তৃষা দে, পিতা-স্বপন কুমার দে, বারমাসিয়া আবদুল করিম উচ্চ বিদ্যালয়। জিনাত আরা বেগম, পিতা-দিদারুল আলম, কাটিরহাট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়। কৌশিক আচার্য্য জয়, পিতা-কিরণ চন্দ্র আচার্য্য, রহমানিয়া উচ্চ বিদ্যালয়। **৮ম শ্রেণিঃ** কাসফী নুসরাত, পিতা-আবদুল মালেক, কাটিরহাট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়। মুহাম্মদ জিয়াউল হাসান, পিতা-মৌলানা ফজলুল করিম, জাফরাবাদ উচ্চ বিদ্যালয়। শামিমা আকতার, পিতা-দিদারুল আলম, ফতেপুর মেহেরনেগা উচ্চ বিদ্যালয়। **৯ম শ্রেণিঃ** সালমা আকতার, পিতা-নূরুল ইসলাম, পশ্চিম গোমদণ্ডী ইউনিয়ন উচ্চ বিদ্যালয়। মোঃ জামশেদুল ইসলাম, পিতা-মুহাম্মদ ফয়েজ আহমদ, কাঞ্চননগর রুস্তমিয়া মুনিরুল ইসলাম দাখিল মাদ্রাসা। মোঃ দিদারুল ইসলাম, পিতা-মোঃ শাহ্ আলম, পশ্চিম গোমদণ্ডী ইউনিয়ন উচ্চ বিদ্যালয়। **১০ম শ্রেণিঃ** নারগিস আকতার, পিতা-আমির হোসেন, মেট্রোপলিটন রেসিডেন্সিয়েল স্কুল এন্ড কলেজ। মর্জিনা আকতার, পিতা-ফরিদুল আলম, পশ্চিম গোমদণ্ডী ইউনিয়ন উচ্চ বিদ্যালয়। মুহাম্মদ আবু ইউসুফ, পিতা-রবিউল হোসেন, মাদ্রাসা-এ-গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী। মুহাম্মদ ইউসুফ, পিতা-মৃত নুরুন্নবী, মাদ্রাসা-এ-গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী। **একাদশ শ্রেণিঃ** উম্মে সালমা, পিতা-আবদুল মালেক, সরকারি হাজী মুহাম্মদ মহসিন কলেজ। ফারজানা আফরোজ নিশাত, পিতা-মোঃ দিদারুল আলম, কাটিরহাট মহিলা ডিগ্রী কলেজ। মোঃ শহিদুল ইসলাম মিনহাজ, পিতা-মোঃ সামশুল আলম, নাজিরহাট ডিগ্রী কলেজ। **দ্বাদশ শ্রেণিঃ** নিশাত সুলতানা, পিতা-শাহে আজম, নাজিরহাট ডিগ্রী কলেজ।

মাদ্রাসা বিভাগঃ আলিমঃ মুহাম্মদ সাইদুল ইসলাম, মাদ্রাসা-এ-গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী। উম্মে হাবিবা, মাদ্রাসা-এ-গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী। ফাতেমা খাইরুন্নেসা, জাফরাবাদ ফাজিল মাদ্রাসা। মোছেনা আকতার, জামেয়া রহমানিয়া ফাজিল মাদ্রাসা। মুহাম্মদ আলী আজম, মাদ্রাসা-এ-গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী। ফাতেমা আকতার, জামেয়া রহমানিয়া ফাজিল মাদ্রাসা। **ফাজিলঃ** নুসরাত খানম আরিফা চৌধুরী, পশ্চিম চাল ইসলামিয়া ফাজিল মাদ্রাসা। মুহাম্মদ জয়নাল আবেদীন, আহমদিয়া করিমিয়া সুন্নিয়া ফাজিল মাদ্রাসা। পারভীন আকতার, নাজিরহাট আহমদিয়া মিল্লিয়া কামিল মাদ্রাসা। মিছবাহুল জান্নাত তানিয়া, পশ্চিম চাল ইসলামিয়া ফাজিল মাদ্রাসা।

উল্লেখ্য, বিশ্বঅলি শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ)'র বার্ষিক ওরশ শরীফের প্রস্তুতি সভায় বৃত্তিপ্রাপ্তদের বৃত্তির টাকা ও সনদপত্র প্রদান করা হবে।

হযরত মূসা আলাইহিস্‌সালাম
-এর স্মরণে
বার্ষিক উৎসবে উৎসবরত
মানুষের জমায়েত

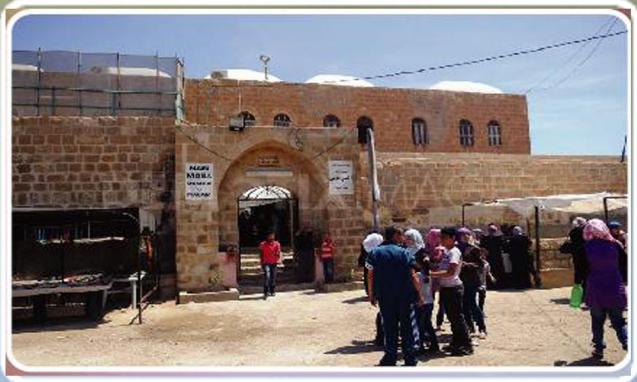

মাদ্‌রাসা-এ-গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর ২০১৩ সনের আলিম ১ম বর্ষের সবক প্রদান অনুষ্ঠানে সবক প্রদান করছেন নাজিরহাট জামেয়া আহমদিয়া মিল্লিয়া কামিল মাদ্‌রাসার প্রধান মুহাদ্দিস মাওলানা মুহাম্মদ আবদুস্ সালাম শরীফি।

'তাজকিয়া বিতর্ক প্রতিযোগিতা ২০১৩'-এর চ্যাম্পিয়ন দল (পিছনে ডান থেকে) 'আসহাবুল ইয়ামিন'-এর তিনজন এবং রানার আপ দল 'কাওকাব'-এর তিনজন এবং (সামনে ডান থেকে) বিশেষ অতিথি বিশ্বজিৎ চৌধুরী, প্রধান অতিথি প্রফেসর ড. ইফতেখার উদ্দিন চৌধুরী, অতিথি মোঃ গোলাম রসূল এবং তাজকিয়ার সভাপতি এইচ আর মেহবুব (দাঁড়ানো)।

THE MONTHLY ALOKDHARA REGD. NO. CHA-272 PRICE: TK. 15.00

শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ) ট্রাস্ট-এর নিয়ন্ত্রণাধীনে পরিচালিত বহুমাত্রিক কল্যাণমুখী প্রতিষ্ঠানসমূহ

শিক্ষা ও শিক্ষাবৃত্তি প্রকল্প :

১. মাদ্‌রাসা-এ-গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী।
২. উম্মুল আশেকীন মুনাওয়ারা বেগম এতিমখানা ও হেফজখানা।
৩. শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ) বৃত্তি তহবিল।
৪. মাইজভাণ্ডার শরীফ গণপাঠাগার।
৫. গাউসিয়া হক ভাণ্ডারী ইসলামিক ইন্‌স্টিটিউট, পশ্চিম গোমদণ্ডী, বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম।
৬. শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ) স্কুল, শান্তিরদ্বীপ, গহিরা, রাউজান, চট্টগ্রাম।
৭. মাদ্‌রাসা-এ-শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী, হামজারবাগ, বিবিরহাট, পশ্চিম সোলশহর, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম।
৮. শাহানশাহ্ হক ভাণ্ডারী ফোরকানিয়া মাদ্‌রাসা, পাটিয়ালছড়ি, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।
৯. শাহানশাহ্ হক ভাণ্ডারী দায়রা শরীফ ফোরকানিয়া মাদ্‌রাসা, সুয়াবিল, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।
১০. মাদ্‌রাসা-এ-শাহানশাহ্ হক ভাণ্ডারী, বারমাসিয়া, বৈদ্যেরহাট, ভুজপুর, চট্টগ্রাম।
১১. শাহানশাহ্ হক ভাণ্ডারী ফোরকানিয়া মাদ্‌রাসা, ফতেপুর, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।
১২. শাহানশাহ্ হক ভাণ্ডারী দায়রা শরীফ ফোরকানিয়া মাদ্‌রাসা, চরখিজিরপুর, বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম।
১৩. মাদ্‌রাসা-এ-শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী, খিতাপচর, বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম।
১৪. জিয়াউল কুরআন ফোরকানিয়া মাদ্‌রাসা ও ইবাদাতখানা, চরখিজিরপুর (ট্যাক্সবর), বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম।
১৫. শাহানশাহ্ হক ভাণ্ডারী ফোরকানিয়া মাদ্‌রাসা, মেহেরআটি, পটিয়া, চট্টগ্রাম।
১৬. জিয়াউল কুরআন সুন্নিয়া ফোরকানিয়া মাদ্‌রাসা, এয়াকুবদণ্ডী, পটিয়া, চট্টগ্রাম।
১৭. শাহানশাহ্ হক ভাণ্ডারী দায়রা শরীফ ফোরকানিয়া মাদ্‌রাসা, চন্দনাইশ (সদর), চট্টগ্রাম।
১৮. বিশ্বঅলি শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ) হাফেজিয়া সুন্নিয়া মাদ্‌রাসা, হাটপুকুরিয়া, বটতলী বাজার, বরুড়া, কুমিল্লা।
১৯. মাদ্‌রাসা-এ-বিশ্বঅলি শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ) হেফজখানা ও এতিমখানা, মনোহরদী, নরসিংদী।

দাতব্য চিকিৎসাসেবা প্রকল্প :

১. হোসাইনী ক্লিনিক (মাইজভাণ্ডার শরীফ)।

দারিদ্র্য বিমোচন ও আর্থিক সহায়তা প্রকল্প :

১. ফুলধারা সমাজকল্যাণ সমিতি (রেজিঃ নং-চট্টগ্রাম ২৬৬৮/০২)।
২. প্রত্যাশা সঞ্চয় প্রকল্প।
৩. যাকাত তহবিল।
৪. দুস্থ সাহায্য তহবিল।

মাইজভাণ্ডারী আদর্শগত গবেষণা ও প্রকাশনা প্রকল্প :

১. মাসিক আলোকধারা।
২. মাইজভাণ্ডারী একাডেমী।

সংগীত ও সংস্কৃতি চর্চা প্রকল্প :

১. মাইজভাণ্ডারী মরমী গোষ্ঠী।
২. মাইজভাণ্ডারী সংগীত নিকেতন।

জনসেবা প্রকল্প :

১. নাজিরহাট তেমুহনী রাস্তার মাথায় যাত্রী ছাউনী ও ইবাদাতখানা।
২. শানে আহমদিয়া গেইট সংলগ্ন যাত্রী ছাউনী।
৩. ন্যায্যমূল্যের হোটেল (মাইজভাণ্ডার শরীফ)।